

Rupali Dip by Humayun Ahmed

suman_ahm@yahoo.com

রূপালী দ্বীপ

হুমায়ুন আহমেদ



প্রস্তাবনা

একুশ খুব অস্ত্রুত একটা বয়স।

এই বয়সে মাথায় বিচিত্র সব পাগলামি ভর করে। বুকের ভেতর থাকে এক ধরনের অস্ত্রিতা। সেই অস্ত্রিতার একটি রূপ হল — “কী যেন নেই”, “কী যেন নেই” অনুভূতি। সেই “কী যেন নেই”-কে খোজার চেষ্টাও এই বয়সেই প্রথম দেখা দেয়। পৃথিবীর বেশির ভাগ সাধুসন্ত এই বয়সে গৃহত্যাগ করেন।

চার বছর আগে জানুয়ারি মাসের এক প্রচণ্ড শীতের রাতে একুশ বছর বয়েসী একদল ছেলেমেয়ে নিয়ে একটা উপন্যাস লিখতে বসেছিলাম। উপন্যাসের নাম ‘দারুচিনি দ্বীপ’। সেই উপন্যাসে একদল ছেলেমেয়ে ঠিক করল, তারা দল বেধে বেড়াতে যাবে প্রবাল দ্বীপ সেন্ট মার্টিন আইল্যান্ডে। সেখানে কাটাবে পূর্ণচন্দ্রের একটি অপূর্ব রাত। আমি উপন্যাস শেষ করব জোছনার সুন্দর একটা বর্ণনা দিয়ে।

পাত্র-পাত্রীদের আমি কিন্তু প্রবাল দ্বীপ পর্যন্ত নিতে পারিনি। তার আগেই উপন্যাস শেষ করতে হয়েছে, কারণ — আমি নিজে তখনো দ্বীপে যাইনি। স্বপ্নের সেই দ্বীপ কেমন আমি জানতাম না।

এখন জানি। সেই অপূর্ব দ্বীপে আমি নিজে এক টুকরো জমি কিনে কাঠের একটা ছোট্ট ঘর বানিয়েছি। তার নাম দিয়েছি — “সমুদ্র বিলাস”。 ফিনিক-ফোটা জোছনায় আমি দেখেছি ঝলন্ত সমুদ্র-ফেনা। আহা, কী দৃশ্য! সেই প্রায় পরাবাস্তব ছবি দেখতে দেখতে মনে হয়েছে, ঐ তরুণ-তরুণীদের শেষ পর্যন্ত নিয়ে যাই-না সমুদ্রের কাছে!

যেখানে শেষ করেছিলাম ‘দারুচিনি দ্বীপ’ সেখান থেকেই শুরু হোক নতুন গল্প ‘রূপালী দ্বীপ’। আসুন, রূপালী দ্বীপের পাত্র-পাত্রীদের সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিই।

ঘন্টা পড়ে গেছে। কমলাপুর রেল স্টেশন থেকে এক্ষুনি ছেড়ে দেবে চিটাগাং মেল। দারুচিনি ধীপের যাত্রীরা সবাই উঠে পড়েছে দ্রুতে। একজন শুধু ওঠেনি। সে হল—বল্টু। বল্টুর ভাল নাম অয়ন। অর্থাৎ পর্বত। পর্বত নাম হলেও এই ছোটখাট মানুষটা মাথা নিচু করে প্ল্যাটফর্মের অক্ষকার কোণায় দাঁড়িয়ে। সে যাচ্ছে না, অথচ তারই যাবার আগ্রহ ছিল সবচে' বেশি। সে চাঁদার টাকাটা জোগাড় করতে পারেনি। অথচ তার আশা ছিল, শেষ মুহূর্তে হলেও টাকা জোগাড় হবে। হয়নি।

প্ল্যাটফর্মে দারুচিনি ধীপের দলটাকে বিদায় জানাতে মুনা এসেছে বাবার সঙ্গে। মুনার ভাই সঙ্গু যাচ্ছে। আপাতদ্বিতীয়ে মনে হতে পারে, মুনা তার ভাইকে বিদায় জানাতেই এসেছে। এই প্রকাশ্য কারণের বাহিরে আছে একটি অপ্রকাশ্য কারণ। প্রকাশ্য কারণ হল—অয়ন। মুনা আসলে এসেছে অয়নকে বিদায় জানাতে। অতি প্রিয়জনদের হাত নেড়ে বিদায় জানাতে খুব কষ্ট হয়, আবার এই কষ্টের সঙ্গে একধরণের আনন্দও থাকে। মুনা মাঝ থেকে টাকা চুরি করে অয়নকে একটা হালকা নীল রঙের সুয়েটার কিনে দিয়েছে। কথা ছিল এই সুয়েটার গায়ে সে দ্রুনে উঠবে। মুনা কল্পনার দ্বিতীয়ে পরিস্কার দেখতে পাচ্ছে—অয়ন নীল রঙের সুয়েটার পরে দ্রুনের কামরা থেকে গলা বের করে তার দিকে তাকিয়ে খুব হাত নাড়ছে। আর সে দেখেও না দেখার ভাব করছে। সে ঠিক করে রেখেছে, ভাল করে তাকাবেও না। অয়ন ভাইরের দিকে ভাল করে তাকালেই তার চোখে পানি এসে যায়। এই অস্তুত ব্যাপারটা কেন হয় কে জানে? আজ সে এটা হতে দেবে না। কিছুতেই তাকাবে না। দরকার হলে চোখ বন্ধ করে রাখবে।

গার্ড সবুজ ফ্ল্যাগ দেলাচ্ছে। সবাই দ্রুনে উঠে পড়েছে। শুধু মোতালেব প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে উদ্বিগ্ন চোখে এদিক-ওদিক দেখছে। সবাই আছে। এক্ষুনি দ্রুন ছেড়ে দেবে। তাহলে কি অয়ন যাচ্ছে না? মোতালেব ভাইকে জিজ্ঞেস করতেও লজ্জা লাগছে। মুনার ধারণা, প্রশ্নটা করলেই মোতালেব ভাই অনেক কিছু টের পেয়ে যাবেন। তিনি ভুক্ত কুঁচকে তাকাবেন। যে তাকানোর অর্থ হচ্ছে—হঠাৎ করে অয়নের কথা কেন? ব্যাপারটা কী? ব্যাপারটা যে কী তা মুনা কাউকে বলতে চায় না। কাউকে না। অয়নকে তো কখনোই না। মৰে গেলেও সে তার গোপন ভালবাসা কাউকে জানাবে না। অন্যদের মতো অয়নকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করবে। অন্যরা যেমন ভাকে বল্টু। সেও ভাকবে বল্টু ভাই।

মোতালেব দ্রুনের কামরায় উঠতে যাচ্ছে। মুনা আর থাকতে পারল না। প্রায় ফিসফিস করে বললো, মোতালেব ভাই, অয়ন ভাইকে তো দেখছি না। উনি আপনাদের সঙ্গে যাচ্ছেন না?

মোতালেব বিরক্ত মুখে বলল, যাওয়ার তো কথা, গাধাটা এখনো কেন আসছে না কে জানে? টেন মিস করবে। গাধাটা সবসময় এরকম করে। আগে একবার পিকনিকে গেলাম। সে গেল না। পরে শুনি, চাঁদার টাকা জোগাড় হয়নি। আরে, একজন চাঁদা না দিলে কী হয়? সবাই তো দিচ্ছি।

মুনা ক্ষীণ স্বরে বলল, ওনার কি টাকার জোগাড় হয়নি?

মোতালেব বলল, কী করে বলব। আমাকে তো কিছু বলেনি।

মুনা অসন্তুষ্ট রকম মন-খারাপ করে বাবার কাছে চলে এল। আর তখনি সে অয়নকে দেখল। অয়ন শুকনো মুখে দাঁড়িয়ে আছে। তার দাঁড়ানোর ভঙ্গি থেকেই বোধা যায়, সে চাচ্ছে না কেউ তাকে দেখে ফেলুক। মুনা চেঁচিয়ে ডাকল, অয়ন ভাই! অয়ন ভাই!

অয়ন প্ল্যাটফর্মে গাদা করে রাখা প্যাকিং বাস্ত্রগুলির আড়ালে সরে গেল। মুনা এগিয়ে গেল। পিছনে এলেন সোবাহান সাহেব।

মুনা বলল, অয়ন ভাই, আপনি যাচ্ছেন না? টেন তো ছেড়ে দিচ্ছে।

অয়ন কী বলবে ভেবে পেল না। সোবাহান সাহেব উত্তেজিত গলায় বললেন, দোড়ে গিয়ে ওঠো। সিগন্যাল দিয়ে দিয়েছে।

অয়ন নিচু গলায় বলল, চাচা, আমি যাচ্ছি না।

'যাচ্ছ না কেন?'

'টাকা জোগাড় করতে পারিনি। একজনের দেয়ার কথা ছিল, সে শেষ পর্যন্ত . . .'

গার্ড বাঁশি বাজিয়ে দিয়েছে। টেন নড়তে শুরু করেছে। অয়ন ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেলল।

মুনার চোখে পানি এসে গেছে। সে ভেজা চোখে তার বাবার দিকে তাকিয়ে আছে।

সোবাহান সাহেব পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে শান্তগলায় বললেন, বাবা, এই নাও, এখানে ছয় শ' টাকা আছে। তুমি যাও। দৌড়াও।

অয়ন ধরা গলায় বলল, বাদ দিন চাচা। আমি যাব না।

অয়নের খুব কষ্ট হচ্ছে। সে কখনোই কোথাও যেতে পারে না, সে জন্যে খুব কষ্ট তো তার হয় না। আজ কেন হচ্ছে?

সোবাহান সাহেব বললেন, এক থাঙ্গড় দেব। বেয়াদব হেলে। দৌড় দাও। দৌড় দাও।

মুনা বলল, যান অয়ন ভাই, যান। পীজ!

অয়ন টাকা নিল।

সে দৌড়াতে শুরু করেছে। তার পেছনে পেছনে দৌড়াচ্ছে মুনা। কেন ছুটছে তা
সে নিজেও জানে না।

দলের সবাই জানালা দিয়ে মুখ বের করে তাকাচ্ছে। ঘোতালের এবং সঙ্গী হাত
বের করে রেখেছে — কাছাকাছি এলেই টেনে তুলে ফেলবে। এই তো আর একটু।
আর একটু...।

সোবাহান সাহেব চোখ বন্ধ করে প্রার্থনা করছেন — “হে মঙ্গলময়! এই
হেলেটিকে দারুচিনি দ্বাপে যাবার ব্যবস্থা তুমি করে দাও।”

ট্রেনের গতি বাড়ছে।

গতি বাড়ছে অয়নের। আর ঠিক তার পাশাপাশি ছুটছে মুনা। সে কিছুতেই
অয়নকে ট্রেন মিস করতে দেবে না। কিছুতেই না।

এখন থেকেই শুরু হল আমাদের নতুন গল্প...。



বেঁটে মানুষ ভাল দোড়তে পারে না। বেঁটে মানুষের পা থাকে খাটো। খাটো পায়ে
লম্বা স্টেপ নেয়া যায় না। কিন্তু বল্টু প্রায় উড়ে যাচ্ছে। সে অসাধ্য সাধন করল,
ছুট্টে ট্রেন প্রায় ধরে ফেলল। তার বন্ধুরা ট্রেনের দরজা-জানালায় ভিড় করে আছে।
রানা হাত বের করে আছে। একবার বল্টুর হাত ধরতে পারলেই ট্রেনে তুলে ফেলবে।
মজার ব্যাপার হচ্ছে — বল্টুর পাশাপাশি ছুটছে মুনা। ট্রেনের কামরা থেকে মুখ বের
করে যাবা। উদ্বিগ্ন চোখে তাকিয়ে আছে তাদের সবার মনে প্রশ্ন — এই মেয়েটা
পাগলের মতো দোড়াচ্ছে কেন? এর তো দারুচিনি দ্বাপে যাবার কথা না। মুনাও যে
শেষ মুহূর্তে বল্টুর সঙ্গে দোড়াতে থাকবে এবং অবিকল বল্টুর মতোই ট্রেনের
দরজার হাতল চেপে ধরবে, তা সে নিজেও বুঝতে পারেনি। যখন বুঝতে পেরেছে
তখন আর সময় নেই। ট্রেনের চাকায় গতির কাঁপন। বেগ ক্রমেই বাঢ়ছে। এখন
প্ল্যাটফর্মে নেমে যাবার উপায় নেই।

প্ল্যাটফর্মে হতভম্ব মুখে মুনার বাবা সোবাহান সাহেব দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি
এখনো পুরো ঘটনাটা বুঝতে পারছেন না। মেয়েটা হঠাৎ তার পাশ থেকে এমন
ছুটতে শুরু করল কেন? কেনই-বা দোড়ে ট্রেনে উঠে পড়ল? ট্রেনে তার বড় ভাই
আছে, এটা একটা ভরসা। অবশ্যি সঙ্গী না থাকলেও সমস্যা হত না। এই
ছেলেমেয়েরা তাঁর মেয়েটার কোনো অনাদর করবে না। এরা সঙ্গীর বন্ধু, তিনি এদের
খুব ভাল করেই চেনেন। মুনা ট্রেনের জানালা থেকে মুখ বের করে বাবার দিকে
তাকিয়ে হাসল। সোবাহান সাহেব এত দূর থেকে সেই হাসি দেখলেন না। তবে তিনি
হাত নাড়লেন। হাত নেড়ে একধরনের অভয় দিলেন, বলার চেষ্টা করলেন, “সব
ঠিক আছে।”

বাবার দিকে তাকিয়ে মুনার কান্না পাচ্ছে। একা একা দাঁড়িয়ে থাকা বাবাকে কী
অসহায় দেখাচ্ছে! যেন একজন ক্লাস্ট, পরিশ্রান্ত মানুষ, যার সব প্রিয়জন একটু
আগেই ট্রেনে করে অনেক অনেক দূরে চলে গেছে, যাদের আর কখনোই ফিরে
পাওয়া যাবে না।

মুনার মনে হচ্ছে, তার বাবা কাঁদছেন। তিনি অল্পতেই কাঁদেন। মুনা যখন
এসএসসি পরীক্ষা দিতে গেল সেদিনও তিনি কাঁদলেন। চোখ মুছতে মুছতে বললেন,

আহা, দেখতে দেখতে যেয়েটা এত বড় হয়ে গেল ! আজ এসএসসি দিচ্ছে। দুদিন
পরে বিয়ে দিতে হবে।

যেদিন এসএসসি-র রেজাল্ট হল সেদিনও কাঁদলেন। রুমাল চোখে চেপে ধরে
গাঢ় স্বরে বললেন, আমি খুব খুশি হয়েছি মা, খুবই খুশি। সেকেন্ড ডিভিশন এমন
খারাপ কিছু না, ম্যাট্রিকের সেকেন্ড ডিভিশনও খুব টাফ। বাবা তার জন্যে রাজশাহী
সিঙ্কের শাড়ি কিনে আনলেন। পরীক্ষা পাসের উপহার। মুনাৰ জীবনের প্রথম শাড়ি।
সারা জীবনে মুনা নিশ্চয়ই অনেক জাগাকাপড় কিনবে। অনেক শাড়ি কিনবে —
কিন্তু জীবনের প্রথম শাড়িটার কথা কখনো ভুলবে না। আচ্ছা, এই তথ্য কি বাবা
জানেন ?

বাতাসে মুনাৰ চুল উড়ছে, গায়ের ওড়না উড়ছে। আৱ সে মনে মনে বলছে,
কেন আমাৰ বাবা এত ভালমানুষ হলেন ? কেন ? কেন ?

দলেৰ সবাই চোখ বড় বড় কৰে মুনাৰ দিকে তাকিয়ে আছে। কেউ কথা বলছে না।
বিষ্ঘয়ের প্রথম ধাক্কা কাটাতে সময় নিচ্ছে। ট্ৰেনেৰ অন্য যাত্ৰীৱাও ব্যাপারটা বেশ
আগ্ৰহ নিয়ে দেখছে। মুনাকে তেমন বিচলিত মনে হচ্ছে না। দৌড়ে ট্ৰেনে এসে ওঠাৰ
পৰিশ্ৰমে সে ক্লান্ত। বড় বড় কৰে নিঃশ্বাস নিচ্ছে। সারা মুখে ঘাম। ওড়নাৰ প্রান্ত
দিয়ে সে মুখেৰ ঘাম মুছল। সে এখন দাঁড়িয়ে আছে রানাৰ সামলে। বসাৰ জায়গা
আছে। ইচ্ছে কৰলে বসতে পাৱে, — বসছে না। ছেলেৱা সিগাৱেট খাবে বলে
আলাদা বসেছে। মুনা যেয়েদেৰ দেখতে পাৱছে না। সে দাঁড়িয়ে আছে যেয়েদেৰ
দিকে পেছন ফিৰে।

সবাৰ প্ৰথমে নিজেকে সামলাল রানা। সে থমথমে গলায় প্ৰায় তোতলাতে
তোতলাতে বলল, তুই কী মনে কৰে ট্ৰেনে লাফিয়ে উঠলি ? চুপ কৰে আছিস কেন ?
জবাব দে। আনসাৰ মি। এৱকম ইডিওচিক একটা কাজ কৰলি কীভাৱে ?

মুনা কিছু বলল না। সে তাৰ বড় ভাই সঞ্জুৰ দিকে তাকাল। সঞ্জু জানালা দিয়ে
মুখ বেৰ কৰে আছে। মনে হচ্ছে ট্ৰেনেৰ কামৰায় এতবড় নাটকীয় ঘটনা যে ঘটে
যাচ্ছে, তাৰ সঙ্গে সঞ্জুৰ কোনো যোগ নেই। সে বাইরেৰ অন্ধকাৰ দেখতেই পছন্দ
কৰছে। ভাবটা এৱকম যেন অন্ধকাৰে অনেক কিছু দেখাৰ আছে। মুনা নামেৰ
ইন্টাৰমিডিয়েট সেকেন্ড ইয়াৱেৰ ছাত্ৰী এই যেয়েটিকে সে চেনে না।

ৰানা এবাৰ হৃক্ষি দিল, কথা বল। মুখ সেলাহি কৰে বেথেছিস কেন ? কী মনে
কৰে তুই লাফ দিয়ে চলন্ত ট্ৰেনে উঠে পড়লি ? পা পিছলে চাকাৰ নিচে গিয়ে মৱেও
তো যেতে পাৰতিস।

‘মৱিনি তো। বেঁচে আছি।’

‘ভাগ্যক্রমে বেঁচে আছিস। কেন উঠলি এখন বল।’

মুনা সহজ গলায় বলল, আমি নিজেও জানি না কেন উঠেছি। জানলে বলতাম। খোকের মাথায় উঠেছি। এখন আমাকে কী করতে হবে? ক্ষমা চাইতে হবে? কার কাছে ক্ষমা চাইব? তোমাদের কাছে, না ট্রেনের কাছে?

‘কথা ঘোরাছিস কেন? স্টেইট কথার স্টেইট জবাব দে।’

আনুশকা বলল, রানা, আপাতত তোমার জেরা বক্ষ রাখো। মেয়েটা হাঁপাচ্ছে। ও শান্ত হোক। মুনা, তুমি এখানে বসো।

‘আমি বসব না।’

‘বসবে না কেন?’

‘আমি তেজগাঁ স্টেশনে নেমে যাব। আমাকে নিয়ে আপনাদের কাউকে দুশ্চিন্তা করতে হবে না।’

রানা গভীর গলায় বলল, তেজগাঁ নেমে যাবি মানে? এই ট্রেন তেজগাঁ থামে না। ফার্স্ট স্টার্পেজ ভৈরব।

‘আমি চেইন টেনে ট্রেন থামাব। তারপর বেবিট্যাঙ্গি নিয়ে বাসায় চলে যাব।’

রানা ঝংকার দিয়ে বলল, তের সাহস বেশি হয়ে যাচ্ছে মুনা। তুই টু মাচ সাহস দেখাচ্ছিস। মেয়েদের টু মাচ করেজ ভয়ংকর।

মুনা ঝঁঝালো গলায় বলল, তুমি উল্টা-পাল্টা ইংরেজি বলবে না তো রানা ভাই, অসহ্য লাগে।

‘আমি উল্টা-পাল্টা ইংরেজি বলি?’

‘হ্যাঁ, বল। আর অকারণে ধমক দাও। শুধু শুধু আমাকে ধমকাছ কেন? আমি কী করেছি?’

‘কথা নেই, বার্তা নেই, তুই লাফ দিয়ে ট্রেনে উঠে পড়লি আর এখন বলছিস, আমি কী করেছি?’

‘বলেছি তো, নেমে যাব। বলার পরেও ধমকাছ কেন?’

মুনার গলা ভারী হয়ে এল। নিজেকে সামলানোর আগেই চোখে পানি এসে গেল। অয়ন ভাই দেখে ফেলছে না তো? সে বিবর্ণ মুখে অয়নের দিকে তাকাল। যা ভয় করেছিল, তাই। অয়ন চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে। মুনা কান্না চাপতে গিয়ে আরো সমস্যায় পড়ল। সমস্ত শরীর ভেঙে কান্না আসছে।

রানা বিব্রত গলায় বলল, কান্না শুরু করলি কী মনে করে? স্টপ ক্রাইৎ। শেষে ধাবড়া খাবি।

মুনা আরো শব্দ করে কেঁদে উঠল।

ট্রেনের গতি কমে আসছে। তেজগাঁ চলে এল বোঝহয়। ট্রেন থামবে না, তবে ধীরগতিতে এগুবে। মুনা দরজার দিকে এগুচ্ছে। রানা বলল, তুই যাচ্ছিস কোথায়? মুনা জবাব দিল না। আনুশকা উঠে এল। মুনার পিঠে হাত রেখে কোমল গলায় বলল, মুনা, তুমি আমার পাশে এসে বসো। তুমিও আমাদের সঙ্গে যাচ্ছ।

মুনা ফেঁপাতে ফেঁপাতে বলল, আমি আপনাদের সঙ্গে গিয়ে কী করব? আপনারা বন্ধুরা গল্প করতে করতে যাবেন। আমি কী করব? আমি কার সঙ্গে গল্প করব?

আনুশকা মুনার কানের কাছে মুখ নিয়ে প্রায় ফিসফিস করে বলল, আমার কিন্তু ধারণা, গল্প করার মানুষ তোমারও আছে। তোমাকে কাঁদতে দেখে সে খুব অস্ত্রিং হয়ে পড়েছে। তুমি যদি তেজগাঁ স্টেশনে নেমে পড় সেও নেমে পড়বে।

‘আপা, আপনি চুপ করুন তো! ’

‘বেশ, চুপ করলাম। তুমিও শাস্ত হয়ে বসো। আমার পাশে বসতে ইচ্ছা না হলে যেখানে ইচ্ছা বসো। বসবে আমার পাশে?’

‘না।’

মুনা করিডোর ধরে এগুচ্ছে। রানা যাচ্ছে তার পেছনে পেছনে। এই মেয়েকে চোখের আড়াল করা ঠিক হবে না। ডেঙ্গারাস মেয়ে। কী করে বসে কে জানে? হয়ত ফট করে লাফ দিয়ে চলস্ত ট্রেন থেকে নেমে গেল। যে চলস্ত ট্রেনে উঠতে পারে, সে নামতেও পারে। রানা নরম গলায় বলল, মুনা শোন, আমার উপর রাগ করিস না। এতগুলি লোক নিয়ে যাচ্ছি, টেনশানে মেজাজ হট হয়ে থাকে — যাচ্ছিস কোথায়? বোস — জানালার কাছে একটা সীট খালি আছে।

মুনা বসল। রানা তার পাশে বসতে বসতে বলল, তোর পাশে কিছুক্ষণ বসি, তোর রাগ কমলে উঠে যাব।

‘আমার রাগ কমেছে। তুমি উঠে ফেতে চাইলে উঠে যেতে পার।’

‘এতগুলি মানুষকে গাইড করে নিয়ে যাওয়ার টেনশান তুই বুঝবি না।’

‘তুমি গাইড করে নিছ মানে? গাইড করে নেয়ার এর মধ্যে কী আছে? সবাই ট্রেনে উঠেছে — ট্রেন যাচ্ছে।’

‘ব্যাপারটা এত সোজা না রে মুনা। একটা দলকে নিয়ে বেড়াতে যাবার কী সমস্য তা শুধু দলপত্তি জানে। আর কেউ জানে না। দলপত্তি হল একটা দলের সবচে’ লোনলি মানুষ। নিঃসঙ্গ শেরপা।’

‘তুমি বুঝি দলপত্তি?’

বলতে বলতে মুনা ফিক করে হেসে ফেলল। রানার মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। বড় ফিচেল টাইপ মেয়ে। এই মেয়ে ভোগাবে বলে মনে হয়। তেজগাঁ স্টেশনে চেইন

ଟେଲେ ତାକେ ନାମିରେ ଦେଖାଇ ଭାଲ ଛିଲ । ରାନା ସିଗାରେଟ୍ ଧରାତେ ଧରାତେ ବଲଲ, ଟିକେଟ ଚେକାର ଏଲେ କୀ ବଲବ ବୁଝାତେ ପାରଛି ନା । ଦୁଜନ ଘାସେ ଉହିଦାଉଟ ଟିକେଟ । ତୁହି ଆର ଜରୀ । ଏକଜନେରୋଡା ହଲେ ସାମାଲ ଦେଯା ଯେତ । ଦୁଜନେରୋଡା କୀଭାବେ ସାମଳାବ ?

‘জরী আপার টিকেট নেই?’

‘ওৱ টিকেট থাকবে কেন? ওৱ কি যাওয়ার কথা? ওকে প্রেশনে দেখে তো আমার অক্ষেল গুড়ুম। টেনশানে ব্রহ্মতালু শুকিয়ে গেছে। অথচ সবাই নির্বিকার। যেন কিছুই হয়নি। এদের নিয়ে বের হওয়াটাই চূড়ান্ত বোকাম হয়েছে। ভেরি গ্রেট মিসটেক। মিসটেক অব দ্য সেনচুরি।’

জৱী বসেছে জানালাৰ পাশে। সে জানালা দিয়ে মুখ বেৰ কৰেছে। নিজেকে আড়াল কৰাৰ জন্যে বড় কৰে ঘোমটাও দিয়েছে। তাকে লাগছে নতুন বৌয়েৰ মতোই। আৱ আসলেই তো সে নতুন বৌ। আজ তাৰ বিয়ে হওয়াৰ কথা ছিল। সব ঠিকঠাক মতো হলে এতক্ষণে সে থাকত বাসৱঘৰে, স্বামীৰ সঙ্গে। স্বামীৰ অধিকাৰ ফলাবাৰ জন্যে লোকটা হয়ত এতক্ষণ তাকে নিয়ে চটকা-চটকি শুରু কৰত।

জরী বিয়ের আসর থেকে পালিয়েছে। তার দু'হাতে মেহেদির সুন্দর ডিজাইন। গায়ের শাড়িটি লাল বেনারসী। গয়না যা ছিল সে খুলে হাতব্যাগে রেখেছে। শাড়ি বদলানো হয়নি। আনুশকার একটা শাড়ি নিয়ে ট্রেনের বাথরুমে গিয়ে বদলে এলো হয়। ইচ্ছা করছে না। বেনারসী পরে ট্রেনের জানলায় যাথা রেখে চুপচাপ বসে থাকতে ভাল লাগছে। অনেক দিন পর নিজেকে মুক্ত লাগছে। জরী তার বন্ধুদের প্রতি ক্রতৃপ্র বোধ করছে। তার বন্ধুরা কেউ এখনো জিঞ্জেস করেনি, কেন জরী বিয়ের আসর ছেড়ে পালিয়ে এল। সবাই এমন ভাব করছে যেন এটাই স্বাভাবিক। এখানে জিঞ্জেস করার কিছু নেই। জরী ঠিক করেছে কাউকে কিছু জিঞ্জেস করতে হবে না, সে নিজ থেকেই বলবে। কিছুই সে গোপন করবে না, কারণ তারা যাচ্ছে দারুচিনি দ্বীপ। তারা ঠিক করে রেখেছে, দারুচিনি দ্বীপে তাদের মধ্যে কোনো আড়াল থাকবে না। তারা তাদের মধ্যকার সব ক্ষুদ্রতা-তুষ্টি দূর করবে।

জরীর পাশে বেশ কিছু খালি জায়গা। মনে হচ্ছে, ইচ্ছে করেই সবাই মিলে জরীকে আলাদা থাকতে দিচ্ছে। সবচে' ভাল হত সে যদি অন্য কোনো কামরায় খানিকক্ষণ বসে থাকতে পারত। তা সম্ভব না। বিয়ের সাজে সাজা একটি মেয়ে কোনো—এক কামরায় সঙ্গীহীন একা বসে আছে, এই দৃশ্য কেউ সহজভাবে নিতে পারবে না, বরং এই—ই ভাল। সে আছে বন্ধুদের মাঝে। বন্ধুরা তাকে আলাদা থাকতে দিচ্ছে। কেউ তার দিকে তাকাচ্ছেও না। এখন তারা চা খাচ্ছে। টেনের বুফে কারের কুৎসিত চা। কিছুক্ষণ পরপর তাই খাওয়া হচ্ছে। মহানন্দে খাওয়া হচ্ছে। সেই খাওয়ারও একেক সময় একেক কায়দা, এখন খাওয়া হচ্ছে পিরিচে। দশজন

ছেলেমেয়ে পিরিচে ঢেলে শব্দ করে চা খাচ্ছে। স্রোতামুটি আন্তর্ভুক্ত দৃশ্য। কামরার অন্য যাত্রীরা কৌতুহলী চোখে তাকাচ্ছে। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করছে না। কুড়ি-একুশ বছরের একদল ছেলেমেয়েকে সবসময়ই বিপজ্জনক ধরা হয়। এদের কেউ ধাঁটাতে চায় না।

যাত্রীদের মধ্যে একজনের কৌতুহল প্রবল হওয়ায় সে বিপজ্জনক কাজাটি করে ফেলল। মোতালেবকে বলল, আপনারা কোথায় যাচ্ছেন?

মোতালেব তৎক্ষণাত্মে অত্যন্ত গভীর হয়ে বলল, আপনি অত্যন্ত জটিল প্রশ্ন করেছেন। মানব সম্প্রদায় কোথায় যাচ্ছে তা সে জানে না। জানলে মানব সম্প্রদায়ের আজ এই দুগতি হত না।

যাত্রীদের বেশির ভাগই হাসছে। শুধু প্রশ্নকর্তা এবং মোতালেবের এই দুজন গভীর মুখে দুজনের দিকে তাকিয়ে আছে। মোতালেবের অনেক দায়িত্বের একটা হচ্ছে পুরো দলটাকে হাসাতে হাসাতে নিয়ে যাওয়া। সে এই দায়িত্ব সুন্দরভাবে পালন করছে।

সবাই হাসছে, শুধু জরী হাসছে না। সে অঙ্ককারের দিকে তাকিয়ে আছে। এক-সময় সে মনে মনে বলল, আম্মাত, তুমি আমার মনটা ভাল করে দাও।

আনুশকা বলল, জরী, তোর ঠাণ্ডা লাগবে। মাথা ডেখের টেনে নে। কচ্ছপের মতো সারাক্ষণ মাথা বের করে রেখেছিস কেন?

জরী বলল, আমার ঠাণ্ডা লাগছে না।

‘বাইরে দেখার কিছু নেই, অঙ্ককারে শুধু শুধু তাকিয়ে আছিস।’

জরী শান্ত গলায় বলল, এই মুহূর্তে আমার অঙ্ককার দেখতেই ভাল লাগছে।

‘ফিলসফারের মত কথা বলছিস যে?’

‘আচ্ছা, আর বলব না।’

‘চল, তোকে নিয়ে চা খেয়ে আসি।’

‘জ্যায়গা ছেড়ে নড়তে ইচ্ছা করছে না।’

‘আর তো তুই।’

জরী উঠল। আনুশকা জরীর হাত ধরে ফিসফিস করে বলল, চোখ মোছ। তোর চোখে পানি। মুখের হাসি সবাইকে দেখানো যায়, চোখের পানি কাউকে দেখাতে নেই।

‘তুই নিজেও তো ফিলসফারের মতো কথা বলছিস।’

‘ফিলসফি ছোঁয়াচে রোগের মতো। একজনকে ধরলে সবাইকে ধরে। কিছুক্ষণ পরে দেখবি, আমাদের বল্টুও ফিলসফারের মতো কথা বলা শুরু করবে।’

তারা দুজন একই সঙ্গে বল্টুর দিকে তাকাল। বল্টু বলল, তোমরা যাচ্ছেন কোথায় ?

‘চা খেতে যাচ্ছি।’

‘চলো, আমিও যাব। তোমাদের বডিগার্ড হিসেবে যাব।’

‘বল্টু, তোমাকে যেতে হবে না। তুমি যেখানে বসে আছ সেখানে বসে থাক। নে মুভমেন্ট।’

‘বল্টু নামটা না ডাকলে হয় না? আমার সুন্দর একটা নাম আছে — অয়ন।’

আনুশকা বলল, এমন কার্যিক নাম তোমাকে মানায় না। বল্টু হল তোমার জন্যে ‘সবচে’ লাগসহ নাম। বল্টু। শিঃ বি।

বুফে কার একেবারে শেষ মাথায়। এদের অনেকক্ষণ হাঁটতে হল। আনুশকা এখনো জরীর হাত ধরে আছে। হাত ধরাধরি করে এক কামরা থেকে অন্য কামরায় যাওয়া বেশ ঝামেলার ব্যাপার, কিন্তু আনুশকা হাত ছাড়ছে না। আনুশকা বলল, জরী, তোর কোন জানিং সবচে ইন্টারেস্টিং মনে হয়?

‘ট্রেন জানি।’

‘আমারো, কী জন্যে বল তো?’

‘চারদিকে দেখতে দেখতে যাওয়া যায়।’

‘হয়নি। ট্রেনে চলার সময় যিক যিক শব্দ হতে থাকে। একধরনের তাল তৈরি হয়, নাচের তাল। এইজন্যেই ভাল লাগে।’

‘আমি এইভাবে কখনো ভাবিনি।’

‘আমিও ভাবিনি। বাবার কাছে শুনেছি। আমার কাছে মনে হয়েছে, এটাই বোধহয় ট্রেন জানি ভাল লাগার আসল কারণ।’

‘কামরায় গাড়িভরা ঘূম, বজনী নিষ্কুম।’

ট্রেনে উঠলেই আনুশকার এই লাইনগুলো মনে হয়। এখনো মনে হচ্ছে, যদিও কারো চোখেই ঘূম নেই — বজনীও নিষ্কুম নয়। ট্রেনের শব্দ ছাড়াও আকাশে মেঘ ডাকছে। বৃষ্টি কি হবে? হলে খুব ভাল হয়। আনুশকা বলল, এক কামরা থেকে আরেক কামরায় যাবার ব্যাপারটা খুব ইন্টারেস্টিং না?

জরী বলল, হ্যাঁ। সায় দেবার জন্যে সায় দেয়া। সে আসলে কিছু শুনছে না। তার শুনতে ইচ্ছা করছে না। সব মানুষই দিনের কিছু সময় নিজের সঙ্গে কথা বলে। পাশের অতি প্রিয়জনও কী বলছে না বলছে তা কানে যায় না।

আনুশকা বলল, এক কামরা থেকে অন্য কামরায় যাবার ব্যাপারটা ইন্টারেস্টিং কেন বল তো?

'জানি না।'

'প্রতিটি কামরার আলাদা অস্তিত্ব আছে। এক-একটি কামরা পার হচ্ছি, আর মনে হচ্ছে — আমরা আলাদা অস্তিত্ব অতিক্রম করে করে এগুচ্ছি।'

'হ্যাঁ।'

'তুই আমার কথা কিছুই শুনছিস না। মন দিয়ে শুনলে হেসে ফেলতি। কারণ আমি খুব সন্তা ধরনের ফিলসফি করছি।'

'আচ্ছা।'

বুকে কারের ম্যানেজার বলল, কটিলেট আর বোম্বাই টোস্ট ছাড়া কিছু নেই। আনুশক্তি বলল, কটিলেট এবং বোম্বাই টোস্ট খাবার জন্যে আমরা আসিন। আমরা চা খেতে এসেছি।

'চা নাই। ওভালটিন আছে।'

'ওভালটিন, ওভালটিন কে খায়? বাংলাদেশ হচ্ছে চায়ের দেশ। এখানে পাওয়া যাবে চা। বিদেশীদের জন্যে কফি। ওভালটিন কেন?'

ম্যানেজার হাই তুলল। জবাব দেবার প্রয়োজন মনে করল না। ওভালটিন বিক্রি করলে লাভ অনেক বেশি থাকে। এই তথ্য মেয়ে দু'টিকে দেবার তার প্রয়োজন নেই। আনুশক্তি বলল, ভাই, আপনি এমন বিশ্বী করে হাই তুলবেন না। আমরা চা খেতে এসেছি। চা খাব। আপনি কোথেকে জোগাড় করবেন তা আপনার ব্যাপার।

'এগারোটার পর সার্ভিস বন্ধ।'

'বন্ধ সার্ভিস চালু করুন। আমরা ঐ কোণয় বসছি। চা না খেয়ে যাব না। শুনুন, চিনি যেন কষ হয়। গাদাখানিক চিনি দিয়ে সরবত বানিয়ে ফেলবেন না।'

ম্যানেজারের কোনো ভাবান্তর হল না। সে আবার হাই তুলল। চলতি টেনে ছেটখাটো বামেলা হয়। এসব পাঞ্চ দিলে চলে না। চা অবশ্য সে সহজেই দিতে পারে। টী-ব্যাগ আছে, গরম পানি আছে। কিন্তু দরকারটা কী? মেয়ে দু'টি খানিকক্ষণ বসে থেকে বিরক্ত হয়ে চলে যাবে। রাগারাগিও হয়তো করবে। করুক-না! অসুবিধা কী?

সুন্দরী মেয়ে রাগারাগি করলেও দেখতে ভাল লাগে। ম্যানেজার মনে মনে অতি কৃৎসিত একটা গালি দিল। সুন্দর সুন্দর মেয়েদের এইসব গালি দিতেও লাগে। ওদের শুনিয়ে গালিটা দিতে পারলে হয়তো আরো ভাল লাগত। সেটা সন্তুষ্য না।

জরী এবং আনুশক্তি মুখোমুখি বসেছে। জানালা খোলা। খোলা জানালায় হহ করে হাওয়া আসছে। এদের শাড়ির আঁচল পতাকার মতো পত্তপত্ত করে উড়ছে। আনুশক্তি বলল, কী বাতাস দেখেছিস?

‘ইঁ’।

‘আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখ — দারুণ বৃষ্টি হবে। ঝমঝমিয়ে একটা বৃষ্টি দরকার। ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামলেই তোর মনের মেঘ কেটে যাবে।’

‘মন বিশেষজ্ঞ হলি কবে থেকে?’

‘অনেক দিন থেকে। আমি নিজেই রোগি, নিজেই ডাক্তার। আমার নিজের মন কীভাবে খারাপ হয়, কীভাবে ভাল হয়, তা আমি মনিটার করি। মনিটার করতে করতে আমার এখন একধরনের ক্ষমতা হয়েছে। মন ভাল করার কৌশল আমার চেয়ে ভাল কেউ জানে না।’

‘বৃষ্টি নামলেই আমার মন ভাল হয়ে যাবে?’

‘ইয়েস ম্যাডাম।’

‘তোর মন হয়তো ভাল হবে। কিন্তু সবার মন তো আর তোর মতো না। আমরা সবাই আলাদা আলাদা।’

‘আলাদা হলেও এক ধরনের মিল আছে। দুঃখ পেলে সবারই মন-খারাপ হয়। সবাই কাঁদে। কেউ শব্দ করে, কেউ নিঃশব্দে।’

জরী ছেট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বলল, সবাই যে কাঁদে তা কিন্তু না, কেউ কেউ হেসেও ফেলে।

আনুশকা চূপ করে গেল। জরী বলল, চা কিন্তু এখনো দেয়নি। লোকটাকে দেখে মনে হচ্ছে সে দেবে না। দেখ দেখ, কী বিশ্রী করে তাকাচ্ছে!

আনুশকা বলল, কী ব্যাপার, এখনো যে চা আসছে না?

ম্যানেজার বলল, একবার তো বলেছি এগারোটা বাজে, সব বন্ধ।

‘আমরা কিন্তু চা না খেয়ে যাব না।’

ম্যানেজার মনে মনে তার প্রিয় গালটা দিল। আফসোস, এরা শুনতে পাচ্ছে না। শুনতে পেলে দৌড়ে পালিয়ে যেত। সে যেখানে বসেছে সেখান থেকে মেঘে দুঁটিকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না। তাতে অসুবিধা নেই। পেছন দিক থেকে একজনের পেটের খানিকটা অংশ দেখা যাচ্ছে। ফর্সা পেট দেখতে ভাল লাগছে। এখান থেকে অনুমান করা যায় গোটা শরীরটা কেমন।

আনুশকা ম্যানেজারের দিকে তাকিয়ে আবার বলল, কী, চা দেবেন না?

ম্যানেজার বলল, না।

আনুশকা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, ‘না’ শব্দটা শুনতে কী খারাপ লাগে লক্ষ করেছিস জরী? অথচ এই শব্দটাই আমরা সবচে’ বেশি শুনি।

‘আমরা নিজেরাও প্রচুর বলি।’

‘আমি বলি না। আমি সব সময় “হ্যাঁ” বলার চেষ্টা করি।’

‘সবার সাহস তো তোর যত্নে না।’

আনুশক্তি বলল, আমি আসলে কিন্তু ভীতু ধরনের একটি মেয়ে। সবসময় সাহসী মুখ্যেশ পরে থাকি। আমাদের ঘদ্যে সত্যিকার সাহসী যদি কেউ থাকে, সে হল তুই নিজে।

‘আমাকে সাহসী বলছিস কেন?’

‘বিয়ের আসর থেকে তুই পালিয়ে এসেছিস। তোর গায়ে এখনো বেনারসী শাড়ি। কটা মেয়ে এই কাজ পারবে?’

‘কাজটা কী আমি ঠিক করেছি?’

‘তা তো আমি বলতে পারব না। তুই বলতে পারবি। আমি বাইরে থেকে তোর ব্যাপারে কি মতামত দেব?’

‘যে ছেলেটার সঙ্গে আমার বিয়ে হচ্ছিল সেই ছেলেটা ভাল না, মন্দ ছেলে।’

‘মানুষের ভাল-মন্দ চট করে বোঝা যায় না। তোর সঙ্গে তো ছেলেটার পরিচয়ই হয়নি। তুই বুঝলি কী করে সে মন্দ?’

‘বিয়ের দু'দিন আগে সে আমাকে একটা রেস্টুরেন্টে নিয়ে যাচ্ছিল। গাড়িতে করে যাচ্ছি, হঠাৎ সে আমার গায়ে হাত দেয়। ড্রাইভার গাড়ি চালাচ্ছে। আমরা পেছনের সীটে।’

‘গায়ে হাত দেয় মানে কী? হাতে হাত রাখে? যে ছেলে জানে দু'দিন পর তোর সঙ্গে তার বিয়ে হচ্ছে, সে অবশ্যই তোর হাতে হাত রাখতে পারে। আমি তাতে কোনো সমস্যা দেখি না।’

‘হাতে হাত রাখা নয়। অন্য ব্যাপার, কুৎসিত ব্যাপার। আমি মুখে বলতে পারব না। এবং এই ব্যাপারটা ড্রাইভারের সামনে ঘটে। ড্রাইভার গাড়ির ব্যাক-ভিউ মিররে পুরো ব্যাপারটা দেখতে পাচ্ছিল। সে ছিল নিবিকার, কারণ এ-জাতীয় ঘটনা এই গাড়িতে আরও ঘটেছে। এটা ড্রাইভারের কাছে নতুন কিছু ছিল না।’

‘তুই তখন কী করলি?’

‘কঠিন গলায় ড্রাইভারকে গাড়ি থামাতে বললাম। তারপর গাড়ির দরজা খুলে দৌড়ে পালিয়ে গেলাম।’

‘কী ঘটেছিল বাসার সবাইকে বললি?’

‘হ্যাঁ, বিয়ে ভেঙে দেয়ার জন্য আমি আমার বড় চাচার পা পর্যন্ত জড়িয়ে ধরে কাঁদলাম। বড় চাচা রাজি হলেন না, কারণ ছেলের নাকি মস্তানদের সঙ্গে ভাল কানেকশন। এরকম কিছু করলে ভয়ংকর ক্ষতি হবে।’

‘জেনেগুনে তোর বড় চাচা এমন একজন ছেলের সঙ্গে তোর বিয়ে ঠিক করলেন?’

‘হাঁজা, করলেন। কারণ ঐ ছেলের সঙ্গে আমার বিয়ে হলে চাচার ব্যবসার সুবিধা হয়।’

‘বিয়ের আসর থেকে তুই পালিয়ে এলি কীভাবে?’

‘বড় চাচী ব্যবস্থা করে দিলেন। আমি হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে বসে ছিলাম। বড় চাচী পালিয়ে যেতে বললেন।’

‘আগে তো শুনেছিলাম, তোর এই চাচী তোকে দেখতে পারে না।’

‘মানুষকে চট করে চেনা যায় না, আনুশক্ত। এই চাচী আমাকে সত্তি পত্তি অপছন্দ করতেন। সারাঙ্গ কঠিন সব অপমান করতেন। আমরা যে তাঁর বাড়ির আশ্রিত অনন্দাম এই কথা দিনের মধ্যে খুব কম হলেও দশবার মনে করিয়ে দিতেন। অথচ এই তিনিই আমার চরম দৃঃসময়ে আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন। আমার মা আমার পাশে এসে দাঁড়াল না, আমার বাবাও না। কে পাশে এসে দাঁড়াল? আমার বড় চাচী।’

আনুশক্ত বলল, চার ব্যাপারটা মন থেকে তাড়াতে পারছি না। মনে হচ্ছে, এক কাপ চা খেতে না পারলে মরে যাব। কী করা যায় বল তো?

জরী বলল, এখন আর শুধু একটা জিনিসই করা যেতে পারে। ঐ লোকটার পায়ে ধরা। সেটা কি ঠিক হবে? সামান্য এক কাপ চায়ের জন্যে পা ধরা? তাও যদি মুদ্র পা হত একটা কথা ছিল।

আনুশক্ত অন্যমনস্ক গলায় বলল, “পায়ে ধরে সাধা, রা নাহি দেয় রাধা” — এই দুটা লাইন রবীন্দ্রনাথের কোন গল্পে আছে বল তো?

‘জানি না। বলতে পারব না। হঠাতে কবিতার লাইন কেন?’

অনুশক্ত বলল, তোর পায়ে ধরার কথা থেকে মনে এল। আমাদের মন বিচিত্র এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ছোটাছুটি করে।

‘গল্পগুচ্ছে আছে জানি, কিন্তু কোন গল্প মনে পড়ছে না। আমার কিছু মনে না এলে খুব অস্থির লাগে। মাথায় চাপা যন্ত্রণা হয়। আমার ইচ্ছা করছে ডেকে ডেকে সবাইকে জিজ্ঞেস করি।’

‘হ্যালো ম্যানেজার সাহেব, বলুন তো “পায়ে ধরে সাধা, রা নাহি দেয় রাধা” — এই লাইন দুটো রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছের কোন গল্পে আছে?’

ম্যানেজার কঠিন চোখে তাকিয়ে রইল। জরী বলল, শুভ বলতে পারবে। যদি কেউ জানে শুভ জানবে।

শুভ শুকনো মুখে একটা সিগারেট ধরিয়েছে। সিগারেট ধরানোর অস্তিত্বে সে প্রায় মরে যাচ্ছে। মোতালেবের চাপাচাপিতে এটা করতে হয়েছে। মোতালেব ভক্ষার দিয়ে

বলেছে — খাবি না মানে? খেতে হবে। গুড বয় হয়ে অনেক দিন পার করেছিস।
আর না। এখন আমরা ব্যাড বয় হব।

‘ব্যাড বয় হলে সিগারেট খেতে হবে?’

‘অবশ্যই খেতে হবে। সিগারেট খেতে হবে। গাঁজা খেতে হবে। শার্টের বুকের
বোতাম খোলা রাখতে হবে। মেরেরা আশেপাশে থাকলে অশ্লীল রসিকতা করতে
হবে। খোল, শার্টের বুকের বোতাম খোল, যাতে বুকের লোম দেখা যায়। তোর
বুকে লোম আছে?’

শুভ্র চোখ-মুখ লাল হয়ে গেল। মোতালেব বলল, লজ্জায় তুই দেখি টমেটোর
মতো হয়ে গেছিস। ফুসফুস ভর্তি করে সিগারেটের ধোঁয়া নে, দেখবি লজ্জা কেটে
যাবে। লাজুক মানুষ এইজন্যেই সিগারেট বেশি খায়। লজ্জা ঢাকার জন্যে খায়।
গাঁজা খেলে কী হয় জানিস?

‘না।’

‘লজ্জা বেড়ে যায়। গাঁজা হল লজ্জাবর্ধক। বিবাটি বডিবিল্ডারও দেখবি গাঁজার
কল্পক্ষেত্রে টান দিয়ে যিহি মেরেলি গলায় কথা বলবে। গাঁজার অন্য মজা।’

শুভ বলল, তুই গাঁজা খেয়েছিস?

‘অবশ্যই খেয়েছি। গাঁজা খেয়েছি। কালিপূজার সময় ভাই-এর যে সরবত করে
তাও খেয়েছি। ভাই-এর সরবত খেলে ইন্টারেন্সিং ব্যাপার হয়। কী হয় শুনতে
চাপ?’

‘চাই।’

‘এই তো পথে আসছিস। আমার ধারণা ছিল তুই বলবি, শুনতে চাই না। দাঁড়া,
তোকে বলব কী হয়। তার আগে জরী আর আনুশকাকে নিয়ে আসি। ওরা
কোথায়?’

‘চা খেতে গিয়েছে বুফে কাবে।’

‘চল, ওদের নিয়ে আসি। ভাই খেলে কী হয় এটা শুনলে মেরেরা খুব মজা পায়।
এটা বলতে হবে মেয়েদের সামনে।

শুভ্র খেতে ইচ্ছা করছে না। সিগারেট হাতে নিয়ে হাঁটতে লজ্জা-লজ্জা
লাগছে। তার কাছে মনে হচ্ছে, সে কোনো অপরাধ করে ফেলেছে এবং মা পরিষ্কার
দেখছেন। এক্ষুনি যেন তিনি বলবেন, শুভ বাবা, তোমার হাতে কী?

মোতালেব বলল, সবাই মিলে ছাদে বসে যেতে পারলে ইন্টারেন্সিং হত।
ত্রৈনের ছাদে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে থাকলে দারুণ লাগে।

শুভ বলল, তায় লাগে না?

‘প্রথম দু’-তিনি মিনিট ভয় লাগে। তারপর আর লাগে না।’

আনুশকা ওদের দেখেই বলল, ঐ ম্যানেজার আমাদের চা দিচ্ছে না। আধ
ঘণ্টার মতো বসে আছি। একটু বলে দেখো না।

মোতালেব বলল, তোমার মতো রূপবতীকে চা দেয়নি, আমাকে দেবে? হাতি
ঘোড়া গেল তল, মোতালেব বলে কত জল?

‘তোমার তো অনেক টেকনিক আছে।’

‘আচ্ছা দেখি। একটা নিউ টেকনিক অ্যাপ্লাই করে দেখি। শুভ্র, তুই আয় আমার
সঙ্গে। এই টেকনিকে ম্যান পাওয়ার লাগে।’

শুভ্র বাধ্য ছেলের মতো রওনা হল। সে ভেবেছিল, তার হাতে সিগারেট দেখে
জরী বা আনুশকা কিছু বলবে। তারা কিছু বলেনি। শুধু জরী সিগারেটের দিকে
তাকিয়ে বিচ্ছিন্ন ভঙ্গিতে হেসেছে। বাঢ়া ছেলে বাবার জুতায় পা চুকিয়ে হাঁটার চেষ্টা
করলে মারা যেমন ভঙ্গিতে হাসে অনেকটা সেই ভঙ্গির হাসি।

মোতালেব কাঁচুমাচু মুখে ম্যানেজারকে বলল, ভাইজান, রূপবতী দুই মহিলা
আধ ঘণ্টার উপর বসে আছে। এদের চা দিচ্ছেন না কেন?

‘বুফে কার বন্ধ।’

‘এখানে আসার পথে দেখলাম, টী-পটে চা নিয়ে ফাস্ট ক্লাসের দিকে যাচ্ছে।’

‘আগে অর্ডার ছিল।’

‘ভাই, আমরা গল্পগুজব করতে করতে ছুটি কাটাতে যাচ্ছি। দেন না। দশটা
টাকা নাহয় বেশি রাখেন। নো প্রবলেম।’

‘বললাম তো, হবে না।’

‘এরা আমাদের দুঃজনকে আশা করে পাঠিয়েছে। এর নাম শুভ্র। অতি ভাল
ছেলে। শুভ্র প্রেস্টিজের একটা ব্যাপারও আছে। চা নিয়ে যেতে না পারলে
মেয়েগুলির সামনে শুভ্র মান থাকবে না।’

‘এক কথা কয়বাব বলব? আপনারা কেন বিরক্ত করছেন?’

‘তা হলে কি এদের নিয়ে উঠে চলে যাব?’

‘সেটা আপনার ইচ্ছা।’

‘ভাইজান, আমরা কিন্তু মানুষ ভাল না। এখন আমরা দুহজন আপনার গায়ে
খুঁতু দেব। খুঁ করে একদলা খুঁতু ফেলব।’

হতভম্ব ম্যানেজার বলল, কি বললেন?

‘আপনার গায়ে খুঁতু ফেলব।’

‘ফাজলামি করছেন নাকি?’

‘জি না ব্রাদার, ফাজলামি করছি না। শুভ্র, এর গায়ে খুঁতু ফেল তো।’

শুভ্র সঙ্গে সঙ্গে থু থু ফেলল। এবং থুথু ফেলে তার নিজেরই বিষ্ময়ের
সীমা রইল না। এটা সে কি করল? কীভাবে করতে পারল?

ম্যানেজার লোকটা কী অঙ্গৃত ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে!

শুভ্র করুণ চোখে তাকাল মোতালেবের দিকে।

মোতালেব সহজ গলায় বলল, এখন আমরা যাই। বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করতে
যাই। আরো পনেরো মিনিট অপেক্ষা করব। পনেরো মিনিটের মধ্যে যদি চা না আসে
তা হলে ট্রেনের দরজা খুলে ধাক্কা দিয়ে তোকে নিচে ফেলে দেব। আমার ভাল নাম
মোতালেব। বন্ধুরা বলে মোতা মিয়া। একবার এক পাঞ্জীর গায়ে পিসাব করে
দিয়েছিলাম। সেই থেকে মোতা মিয়া নাম।

মোতালেবেরা জরীদের কাছে ফিরে গেল। জরী বলল, চা আসছে?

মোতালেব বলল, বুঝতে পারছি না। তবে সম্ভাবনা আছে। অবুধ দিয়ে
এসেছি। অমুখে কাজ হবে কি না জানি না। হতে পারে, আবার নাও হতে পারে।
আবার উল্টা অ্যাকশানও হতে পারে।

‘অবুধটা কী?’

‘মাইল্ড ডোজের সালফা ড্রাগ দেয়া হয়েছে। সালফা ড্রাগে কাজ না হলে
অ্যান্টিবায়োটিক দেয়া হবে। ব্রড স্পেকট্রাম অ্যান্টিবায়োটিক।’

জরী বলল, শুভ্র মুখটা এমন মলিন লাগছে কেন? কী হয়েছে শুভ্র?

শুভ্র জবাব দিল না। চোখ নিচে নামিয়ে নিল। লজ্জায় সে মাথা তুলতে পারছে
না।

আনুশক্তি বলল, আচ্ছা শুভ্র, এই লাইন দুটা কোথায় আছে বলতে পারবে?

“পায়ে ধরে সাধা

রা নাহি দেয় রাধা।”

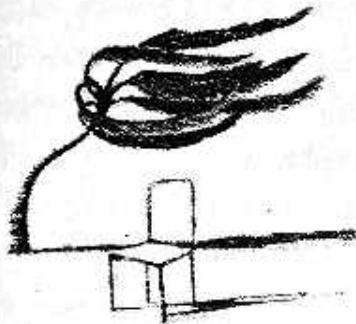
শুভ্র ক্ষীণ গলায় বলল, গল্পগুচ্ছে আছে।

‘গল্পের নাম কী?’

‘গুপ্তধন।’

‘Thank you learned কানাবাবা। থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি যাচ।’

প্রশংসাবাক্যেও শুভ্রের কিছু হল না। তার মুখ মলিন হয়েই রইল। তার শুধু মনে
হচ্ছে, যদি কোনোদিন মা এই ঘটনা জানতে পারেন তার কেমন লাগবে? মা
অবশ্যই জানতে চাইবেন সে কেমন করে এই কাজটা সে করল? তখন সে কী
বলবে? কিংবা মা হয়তো কিছুই জানতে চাইবেন না। শুধু শাস্তি চোখে তাকিয়ে
থাকবেন। সে তো আরো ভয়াবহ।



শুভ্র মা রাহেলার ব্লাডপ্রেশার হঠাতে করে বেড়ে গেছে। রাতে ঘুমুতে যাবার আগে দাঁত মাজ ছিলেন, হঠাতে মাথা ঘুরে উঠল। তিনি দেয়াল ধরে টাল সামলালেন। এরকম অবস্থায় কোথাও বসে যাওয়া উচিত। আশেপাশে বসার কিছু নেই। বসতে হলে মেঝেতে বসতে হয়। রাহেলা ক্ষীণ স্বরে ডাকলেন, মধুর মা, মধুর মা!

মধুর মা একতলায় ছিল। রাহেলার গলার স্বর এতদূর পৌছানোর কথা না, কিন্তু মধুর মার কান খুব পরিষ্কার। সে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এল। রাহেলা প্রায় ফিসফিস করে বললেন, বেতের চেয়ারটা এনে দাও। বসব। আমার মাথা ঘুরছে।

মধুর মা বেতের চেয়ার এনে দিল।

'বরফ গিশিয়ে আমাকে ঠাণ্ডা এক গ্লাস পানি দাও।'

'শ্রীর বেশি খারাপ আশ্মা? ডাঙ্গার খবর দিব।?'

'ডাঙ্গার লাগবে না। শুভ্রের ঘরে বাতি জ্বলছে কেন? বাতি জ্বলাল কে? যাও, বাতি নিভিয়ে দরজা বন্ধ করে আসো। পানি পরে আনবে।'

'দরজায় তালা দিয়ু আশ্মা?'

'হ্যাঁ, তালা দাও।'

মধুর মা শুভ্রের ঘরে ঢুকল। রাহেলা অস্থিতি বোধ করতে লাগলেন। শুভ্রের ঘরে কেউ ঢুকলে তাঁর ভাল লাগে না। শুভ্র বাড়ি ছেড়ে গেছে তিনি ঘণ্টাও হয়নি। তাঁর কাছে মনে হচ্ছে অনন্তকাল পার হয়ে গেছে। এই প্রথম শুভ্রের বাড়ি ছেড়ে বাইরে যাওয়া। শুভ্র আর দশটা ছেলের মতো হলে তিনি এতটা বিচলিত হতেন না। সে আর দশটা ছেলের মতো নয়। চোখ থেকে চশমা খুলে ফেললে সে কিছুই দেখে না। একজনকে সারাক্ষণ তার চশমা খুঁজে দিতে হয়। তার ওপর শুভ্রের চশমা-ভাঙ্গা রোগ আছে। অকারণে হোচ্ট খেয়ে পড়ে চশমা ভেঙে ফেলবে। তিনি অবশ্য শুভ্রের ব্যাগে দুটি বাড়তি চশমা দিয়ে দিয়েছেন। প্রয়োজনের সময় সেই চশমা দুটি শুভ্র কি খুঁজে পাবে?

মধুর মা গ্লাসে করে হিম-শীতল পানি নিয়ে এল। এক চুমুক পানি খেয়েই

ରାହେଲାର ମନେ ହଲ, ତା'ର ଆସଲେ ପିପାସା ପାଇବାନ । ରାହେଲା ବଲଲେନ, ମଜିଦ କି ଏମେହେ ଘରୁର ମା ?

‘ଜ୍ଞାନ ଆସଛେ ।’

‘କତଞ୍ଚିନ ହଲ ଏମେହେ ?’

‘ଅନେକକଷଣ ।’

‘ଆମାକେ ବଲନି କେନ ?’

ରାହେଲା ଉଠେ ଦାଢ଼ିଲେନ । ତା'ର ମାଥା ଅବଶ୍ୟ ଏଖନୋ ସୁରହେ । ଆଜ ସକାଳେ ବ୍ଲାଡ୍-ପ୍ରେଶାରେ ଓସୁଧ କି ତିନି ଖେଯେଛେ ? ରାହେଲା ମନେ କରତେ ପାରଲେନ ନା । ମଜିଦକେ ପାଠାତେ ହବେ ଡାଙ୍କାର ମାହେବକେ ଆନାର ଜନ୍ୟ । ରାହେଲାର ଏକ ଦୂର ସମ୍ପର୍କେର ଚାଚା ତା'ର ଡାଙ୍କାର । ଓର ବାସାୟ ଟେଲିଫୋନ ନେଇ, ଖବର ଦିତେ କାଉକେ ପାଠାତେ ହୟ ।

ଦରଜାର ବାହିରେ ଦାଢ଼ିଯେ ମଜିଦ ଖୁକ ଖୁକ କରେ କାଶଲ । ରାହେଲା ବଲଲେନ, ମଜିଦ, ତୁମି କଥନ ଏମେହ ?

‘ଅନେକକଷଣ ହହିଲ ଆସଛି ।’

‘ଖବର ଦାଓନି କେନ ?’

ମଜିଦ ଅନ୍ୟଦିକେ ତାକିଯେ ମାଥା ଚୁଲକାଛେ । ଏ ବାଡ଼ିର ସବକଟା କାଜେର ମାନୁଷ ଏମନ ଗାଧା କେନ ? ମଜିଦକେ ଷେଷନେ ପାଠାନୋ ହେଯେଛିଲ ଦୂର ଥେକେ ଦେଖାର ଜନ୍ୟ ଶୁଭ୍ର ଠିକମତ ଟ୍ରେନେ ଉଠାତେ ପାରଲ କି ନା । ଏହି ଖବର ସେ ବାସାୟ ଏସେ ଦେବେ ନା ?

‘ଶୁଭ୍ର କି ଟ୍ରେନେ ଠିକମତ ଉଠେଛେ ?’

‘ଜ୍ଞାନ ଆସିବା ।’

‘ଓର ବନ୍ଦୁରା ସବ ଛିଲ ?’

‘ଜ୍ଞାନ, ଛିଲ ।’

‘ଶୁଭ୍ର ତୋମାକେ ଦେଖାତେ ପାଯାନି ତୋ ?’

‘ଜ୍ଞାନ ନା । ଛୋଟ ଭାଇଜାନେର ଚୋଖେ ଚଶମା ଛିଲ ନା ।’

ରାହେଲା ହତଭ୍ୟ ହେଯେ ଗେଲେନ । ଏହି ଗାଧା କୀ ବଲଛେ ! ଚୋଖେ ଚଶମା ଛିଲ ନା ମାନେ କୀ ? ଗାଧାଟା କି ଜାନେ ନା, ଚଶମା ଛାଡ଼ା ଶୁଭ୍ର ଅନ୍ଧ ? ନିଜେକେ ସାମଲେ ନିଯେ ସହଜ ଭାଙ୍ଗିତେ ରାହେଲା ବଲଲେନ, ଚୋଖେ ଚଶମା ଛିଲ ନା ?

‘ଜ୍ଞାନ ନା ।’

‘ଚଶମା ଛାଡ଼ା ସେ ଟ୍ରେନେ ଗିଯେ ଉଠିଲ କୀଭାବେ ?’

‘ଏକଜନ ସୁନ୍ଦରମତ ଆପା ଉନାର ହାତ ଧଇରା ଟେରେଇନେ ନିଯେ ତୁଳଛେନ ।’

‘ତୁମି ଜିଜ୍ଞେସ କରନି, ଆପନାର ଚଶମା କୋଥାଯ ?’

‘ଜ୍ଞାନ ନା । ଆପନେ ବଲଛେ ଦୂର ଥାଇକ୍ୟା ଦେଖାତେ ।’

গাধাটার সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছা করছে না। রাহেলা দোতলায় উঠে এলেন। এহটুক সিডি ভাঙতেই তাঁর দম আটকে আসছে। মনে হচ্ছে মাথা ঘুরে মেঝেতে পড়ে যাবেন। শুভ্র মাকে দিয়ে খবর পাঠালেন যেন ভাঙ্গার আলা হয়। বাড়ি দেখলেন, শুভ্র বাবার আসার সময় হয়েছে। তাঁর সঙ্গে কথা বললে রাহেলার মনের অস্থিরতা কিছুটা কমবে। মানুষটা হয়ত মুক্তি দিয়ে বোঝাবে, চশমা ছাড়া শুভ্রের তেমন অসুবিধা হবে না। কিংবা কোনো ব্যবস্থা করবে যেন টেনেই শুভ্র চশমা পেয়ে যায়। ‘সুন্দরমত একজন আপা শুভ্রের হাত ধরে টেনে তুলেছে।’ সেই সুন্দরমত আপটা কে? শুভ্রের কোনো মেয়েবকু আছে বলে তিনি জানেন না। এ বাড়িতে মেয়েরা কখনো আসেনি। কারো সঙ্গে ভাব থাকলে শুভ্র নিশ্চয়ই তাকে এ বাড়িতে আসতে বলত। রাহেলার খুব শরীর খারাপ লাগছে। আবার পিপাসা হচ্ছে। হাত কাঁপছে।

শুভ্র বাবা বাড়ি ফিরলেন রাত বারোটা দশ মিনিটে। এত রাতে তিনি কখনো বাড়ি ফিরেন না। তাঁর টঙ্গী সিরামিকস কারখানার সমস্যা হচ্ছে বলে গত কয়েক রাত ফিরতে দেরি হচ্ছে।

ইয়াজউদ্দিন সাহেব দোতলায় উঠে দেখলেন, শুভ্র ঘরে বাতি ঝলছে। তিনি বিস্মিত হয়ে উকি দিলেন। শুভ্রের বিছানায় রাহেলা পা তুলে বসে আছেন। রাহেলার মাথার চুল ডেজা। মনে হচ্ছে কিছুক্ষণ আগেই মাথায় পানি ঢালা হয়েছে। ইয়াজউদ্দিন সাহেব বললেন, কী ব্যাপার?

রাহেলা ক্ষীণ গলায় বললেন, শুভ্র তার চশমা হারিয়ে ফেলেছে।

‘শুভ্রের কথা জানতে চাচ্ছি না। তোমার কী হয়েছে?’

‘আমার খুব অস্থির লাগছে।’

‘প্রেশার বেড়েছে?’

‘হ্যাঁ।’

‘ডাঙ্গার এসেছিল?’

‘হ্যাঁ।’

‘প্রেসার এখন কত?’

‘উনি বলেননি। অশুধ খেতে দিয়েছেন।’

‘খেয়েছে?’

‘হ্যাঁ।’

ইয়াজউদ্দিন সাহেব চেয়ার টেনে রাহেলার মুখোগুঁথি বসলেন।

‘ভাত খেয়েছে রাহেলা?’

‘না।’

‘উঠে খাবার দিতে বলো। আমি গোসল করে চারটা খাব। খাবার টেবিলে কথা হবে। শুভ্রের চশমার ব্যাপারে এত চিন্তিত হবার কিছু দেখছি না। তুমি কি ওকে বাড়তি চশমা দাওনি?’

‘ওর হ্যান্ডব্যাগে দুটা আছে। কিন্তু ওকে তো বলা হয়নি।’

‘না বললেও অসুবিধ হবে না। একসময়—না এক—সময় ও ব্যাগ খুলবে। ব্যাগ খুললেই পেয়ে যাবে।’

রাহেলা ফিসফিস করে বললেন, যদি ব্যাগটা হারিয়ে ফেলে? চোখে তো এখন দেখছে না। নিজের ব্যাগ চিনবে কী করে?

ইয়াজউদ্দিন সাহেব ধৈর্য হারালেন না। শান্ত গলায় বললেন, চিটাগাং নেমে নতুন চশমা বানিয়ে নেবে। প্রেসক্রিপশন সবসময় শুভ্র মানিব্যাগে থাকে। থাকে না?’

‘হঁ।’

‘নামো তো বিছানা থেকে। নামো।’

‘আমার খুব অস্থির লাগছে।’

‘শোনো রাহেলা, আমি বরং এক কাজ করি। আমাদের চিটাগাং অফিসের সিদ্ধিককে বলে দিই, সে ভোরবেলা চিটাগাং রেল স্টেশনে যাবে এবং শুভ্রকে বলবে, তার হ্যান্ডব্যাগের সাইড পকেটে চশমা আছে।’

‘আছা।’

‘তোমার অস্থিরতা কি এখন একটু কমেছে?’

রাহেলা জবাব দিলেন না। ইয়াজউদ্দিন সাহেব শান্ত গলায় বললেন, আমি ত্রুনে একজন লোক রেখেছি। সে সবসময় শুভ্রের উপর লক্ষ রাখবে। তোমাকে এই খবরটা জানাতে চাচ্ছিলাম না। কিন্তু প্রেশার-ট্রেশার বেড়ে তোমার যা অবস্থা হয়েছে, আমার মনে হল জানানো উচিত।

ইয়াজউদ্দিন সাহেব উঠে দাঁড়ালেন। স্ত্রীর হাত ধরে তাঁকে নিচে নামালেন। রাহেলা বললেন, মজিদ বলছিল, সুদর্শন একটা মেয়ে নাকি শুভ্রের হাত ধরে তাঁকে ত্রুনে নিয়ে তুলছে।

‘ভালই তো। সবসময়ে এক্ষুর মতো কাউকে কাছে পাচ্ছে।’

‘আমার কেন জানি খুব খারাপ লাগছে। মনে ইচ্ছে ভয়ংকর কিছু ঘটবে।’

‘ভয়ংকর কিছুটা কী হবে বলে মনে করছ?’

‘ওরা সমৃদ্ধ নামবে, তারপর চোরাবালিতে আটকে যাবে।’

‘ও তো একা যাচ্ছে না। ওর আট-ন’জন বন্দু আছে। একজন চোরাবালিতে

আটকালে অন্যরা টেনে তুলবে।'

'বিপদের সময় কাউকে কাছে পাওয়া যায় না।'

'ঐ মেয়েটিকে পাওয়া যাবে বলে আমার ধারণা।'

'কোন মেয়ে ?'

ইয়াজউদ্দিন সাহেব হাসতে হাসতে বললেন, সুন্দরমত মেয়েটি। যে শুভ্রের হাত
ধরে তাকে টেনে তুলে নিল। তুমি এখনো এত অস্থির হয়ে আছ কেন? যাও, নিচে
গিয়ে খাবার গরম করতে বল। আমি চিটাগাং টেলিফোন করছি।

'ম্যানেজার সাহেবের সঙ্গে আমিও কথা বলব।'

'তোমার কথা বলার কোনো প্রয়োজন দেখছি না। যা বলার আমি গুছিয়ে বলব।'

'চশমাটা আছে ওর হ্যান্ডব্যাগের ডান দিকের পকেটে। ডিসপোসেবল রেজার,
শেভিং ক্রীম, সাবান, টুথপেস্ট, টুথব্রাশ সব আছে বাঁ দিকের পকেটে।'

'আমি বলে দেব।'

রাহেলা কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে বললেন, শুভ্রের জন্যে আমার এই যে ভীতি,
তোমার কাছে তা কি অস্বাভাবিক মনে হয়?

ইয়াজউদ্দিন সাহেব বললেন, না। অন্য সবার কাছে মনে হবে তুমি বাড়াবাড়ি
করছ। কিন্তু আমার কাছে মনে হবে, না। কারণ অন্যরা জানে না, কিন্তু আমরা
জানি, শুভ্রের চোখের নার্স শুকিয়ে আসছে। অতি দ্রুত তার চোখ নষ্ট হয়ে যাবে।
সে কিছুই দেখবে না।

রাহেলা খমখমে গলায় বললেন, বারবার তুমি এই কথা মনে করিয়ে দাও কেন?

'তোমাকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করার জন্যেই করি। বড় ধরনের ক্যালামিটির
জন্যে মানসিক প্রস্তুতি দরকার। মানসিক প্রস্তুতি থাকে না বলেই আমরা কোনো
বিপদের মুখ্যমুখ্য দাঁড়াতে পারি না।'

'তুমি পার ?'

'ই়্যা, আমি পারি।'

রাহেলার মাথা ঘুরে উঠল। তিনি শ্বেত স্বরে বললেন, আমার কেমন জানি
লাগছে!

ইয়াজউদ্দিন রাহেলার হাত ধরে ফেললেন। ঠাণ্ডা হাত। সেই হাত খরখর করে
কাঁপছে।



ରାତ ବାଜେ ଦୁଟାର ମତୋ ।

କଥା ଛିଲ ସାରା ରାତ ସବାଇ ଜେଗେ ଥାକିଲେ । ହୈଟେ କରତେ କରତେ ଯାବେ । ମନେ
ହଞ୍ଚେ ସବାର ଉଦ୍‌ସାହେ ଭାଟା ପଡ଼େଛେ । ବଲ୍ଟୁ ଗୋଡ଼ା ଥେକେଇ ମନମରା ଛିଲ । ତାର ମନମରା
ଭାବ ରାତ ଏକଟାର ଦିକେ କାଟିଲ । ମେ ମୋତାଲେବେର କାହିଁ ଥେକେ କ୍ୟାମେଟୋ ପ୍ଲେଯାର ନିଯେ
ଫୁଲ ଭଲ୍ୟମେ କ୍ୟାମେଟୋ ଚାଲୁ କରିଲ । ବନ୍ୟାର ରବୀନ୍‌ଦ୍ରସଂଗୀତ । ତବେ କ୍ୟାମେଟୋ ଦୋଷ
ଆଛେ । ମନେ ହଞ୍ଚେ ବନ୍ୟାର ଗଲାଯ ଲ୍ୟାରିନଜାଇଟିସ । ଭାଙ୍ଗ ଗଲାଯ ଗାନ, —

ମଧ୍ୟ ବସେ ଶୁଣି ଖେଳି ବେଳା
ଶୁଧୁ ହାସି ଖେଳା ଆର କି ଭଲ ଲାଗେ ?

ଚଶମାପରା ଦାଡ଼ିଓୟାଲା ଏକ ଭଦ୍ରଲୋକ ହଠାତ୍ ପେଛନ ଥେକେ ଉଠେ ଏସେ କଠିନ
ଗଲାଯ ବଲିଲେନ, ଆପନି କି ଗାନ ବନ୍ଧ କରିବେନ ?

‘ବନ୍ଧ କରିବେନ, କାରଣ, ରାତ ଦୁଟା ବାଜେ । ଏଥିନ ଗାନେର ସମୟ ନା । ଏଥିନ ଘୁମୁବାର
ସମୟ ।’

‘ଆପନାର ଜନ୍ୟେ ଘୁମୁବାର ନମୟ । ଆପନି କୋଲବାଲିଶ ନିଯେ ଶୁଯେ ପଡ଼ୁନ ।
ଆମାଦେର ଏଥିନ ଜେଗେ ଥାକାର ସମୟ ।’

ଚଶମାଓୟାଲା ଲୋକ ସମର୍ଥନେର ଆଶାଯ ଚାରଦିକେ ତାକାଇଁ । କାଜେଇ ସମର୍ଥନ
ପାବାର ଆଗେଇ ବଲ୍ଟୁକେ ସାପୋଟେ ଦେବାର ଜନ୍ୟେ ମୋତାଲେବ ବଲଲ, ଗାନେର ପରେପରେଇ
ଆଛେ ନୃତ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ । ଆପନାଦେର ସବାଇକେ ଆମ୍ବଦ୍ରଣ । ଆମାଦେର ଦଲେ କରେକଜନ
ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଆଛେନ । ନଇମା, ନାଚେର ଜନ୍ୟେ ତୈରି ହେ ।

ନଇମାର ଜନ୍ୟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅପମାନସୂଚକ କଥା । ତାର ବିଶାଳ ଶରୀରେର ଦିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ
କରେଇ ତାକେ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ବଲା ହଞ୍ଚେ । ଅତିବଢ଼ ବୋକାଓ ଏଟା ବୁଝିବେ । ନଇମାର ପାଶେ
ନୀରା ବଦେହିଲ । ମେ ଖିଲଖିଲ କରେ ହାସତେ ଶୁରୁ କରେଛେ, ଯେନ ଏହି ପଥିବୀର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ
ରମ୍ପିକତା ମେ ଏହିମାତ୍ର ଶୁନିଲ ।

চশমাপরা ভদ্রলোক বললেন, আপনারা আমাদের সারা রাত বিরক্ত করবেন,
তা তো হয় না।

বল্টু বলল, প্রতিরাতেই যে ঘূমতে হবে তার কি কোনো মানে আছে? একটা
রাত না ঘূমিয়ে দেখুন কেমন লাগে। খারাপ লাগবে না।

কথাবার্তার এই পর্যায়ে রানা উঠে বলল, নো মিউজিক। গান বক্স। অন্য
যাত্রীদের সুবিধা-অসুবিধাও আমাদের দেখতে হবে।

সে চশমাপরা লোকের কাছে এগিয়ে শিয়ে বলল, ওল্ড ব্রাদার, নো অফেল্স।
যান, শুয়ে পড়ুন।

মোতালেবের গা জ্বলে গেল। ট্রেন ছাড়ার পর থেকেই রানা এই আলগা
মাত্বকরিটা করছে। সহের সীমা অতিক্রম করে যাচ্ছে। কষে এর পাছায় একটা
লাখি বসিয়ে দেয়া দরকার। লোকজনের সামনেই দেয়া দরকার, যাতে গাধাটার
একটা শিক্ষা হয়। মাত্বকর!

মুনা জানালা দিয়ে বাইরের অঙ্ককার দেখছিল। অঙ্ককারে দেখার কিছু নেই, তবু
ভাল লাগছিল। ভাল বৃষ্টি হচ্ছে। বৃষ্টিও দেখা যাচ্ছে না। তবে বৃষ্টির শব্দ শুনতে খুব
সুন্দর লাগছে। চল্লম্ব ট্রেন থেকে বৃষ্টির শব্দ যে এত সুন্দর লাগে কে জানত?

রানা এসে খট করে মুনার জানালা বক্স করে বলল, নো বৃষ্টিতে ভিজাভিজি।
ঘুমা। ঘূমিয়ে পড়।

রানা এসে বসল সঞ্চৰ পাশে। সঞ্চৰকে খুব মনমরা লাগছে। দলের কেউ কোনো
কারণে বিষণ্ণ হলে সেটা দেখার দায়িত্বও তার।

‘কী হয়েছে রে সঞ্চৰ?’

‘কই, কিছু হয়নি তো।’

‘মন-খারাপ করে বসে আছিস কেন? কী হয়েছে বল।’

‘কিছু হয়নি।’

‘মুনা লাফ দিয়ে ট্রেনে উঠে পড়েছে এইজন্যে মন খারাপ? বাদ দে, বাচ্চা মেয়ে
মিসটিক করে ফেলেছে। হেভি বকা দিয়ে দিয়েছি। তুই যদি মুখ ভোঁতা করে
রাখিস তা-হলে মুনা ভাববে তার জন্যে তোর মন-খারাপ। এই কাজটা সে করল কী
করে তাই আমি এখনো বুঝতে পারছি না। এমন তো না যে বেকুব মেয়ে . . . নে
সঞ্চৰ, সিগারেট নে।’

সঞ্চৰ সিগারেট নিল। মুনা কী জন্যে লাফ দিয়ে ট্রেনে উঠেছে তা সে না
জানলেও অনুমান করতে পারছে। মুনার জন্যে তার খুব মায়া লাগছে।

‘বি হ্যাপি সঞ্চৰ, বি হ্যাপি। মন-খারাপ করে থাকবি না। আমি যাই, চিত্রির সঙ্গে
ম্যানেজ করে আসি। টাকা খাইয়ে আসি।’

‘টাকা খাওয়াবি কেন?’

‘আমাদের মধ্যে দুজন আছে না — টিকেট ছাড়া? টাকা না খাওয়ালে হবে কী ভাবে? আমি অবশ্যি প্রিলিমিনারি আলাপ করে রেখেছি। চোখ-টিপি দিয়ে দিয়েছি। এইসব লক্ষ রাখতে হবে না? নয়তো চিটাগাং নামতেই ঝামেলায় পড়ে যেতাম। আমি ম্যানেজ না করলে এতসব ঝামেলা তোরা মেটাবি কী করে? তোর তো আবার সব ভদ্রলোক। এই দেখ-না, বৃষ্টি হচ্ছে অথচ সবার জানালা খোলা। ঠাণ্ডা লেগে বুকে কফ বসে গেলে অবস্থাটা কী হবে? কোথায় পাব ডাঙ্গার? কোথায় পাব অমুধ?’

রানা ব্যস্ত পায়ে উঠে চলে গেল। রানা চলে যেতেই মুনা আবার তার জানালা খুলে দিল। জানালা খোলার সময় ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে লাঞ্ছুক ভঙ্গিতে হাসল। সঙ্গেও হাসল।

বুম বৃষ্টি হচ্ছে।

জরীর পাশের জানালা খোলা। বৃষ্টির ছাট আসছে। আনুশকা বলল, জরী, তুই ভিজে যাচ্ছিস। জানালা বন্ধ করে দে।

জরী বলল, আমার ভিজতে ভাল লাগছে।

‘অসুখ বাধাবি। নিউমোনিয়া হবে। আমাদের সব প্রোগ্রাম বানচাল হবে।’

‘সেটাও মন্দ না। মানুষের জীবনে প্রোগ্রাম ছাড়া কিছু কিছু অংশ থাকা দরকার। যে অংশে আগেভাগে কিছু ভাবা হবে না — যা হ্বার হবে।’

আনুশকা হাসিমুখে বলল, এটা কি কোনো দার্শনিক তত্ত্ব?

‘খুবই সাধারণ তত্ত্ব। দার্শনিক-ফার্মিক না।’

‘জরী, তুই কিন্তু ভিজে ন্যাতা—ন্যাতা হয়ে গেছিস।’

জরী হালকা গলায় বলল, তুই একটা প্রসঙ্গ নিয়ে এত কথা বলিস যে, রাগ লাগে। কথা বলার তো আরো বিষয় আছে।

‘আচ্ছা যা, এই প্রসঙ্গে আর কথা বলব না। শুভকে দেখছি না কেন রে জরী? শুভ কোথায় গেল?’

‘যাবে আবার কোথায়? দ্রেনেই আছে। মনে হয় এক কামরা থেকে আরেক কামরায় সিগারেট হাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে।’

‘ওর এমন একা ঘুরে বেড়ানো ঠিক না। চোখে কম দেখে।’

জরী হেসে ফেলল। আনুশকা বলল, হাসছিস কেন?

‘তোর মাতৃভাব দেখে হাসছি। তোর মধ্যে একটা দলপতি-দলপতি ব্যাপার আছে। সব সময় লক্ষ করেছি, আমরা কোথাও গেলেই তুই দলপতি সেজে

ফেলিম। সব চিন্তা-ভাবনা নিজের মাথায়। আমাকে নিয়ে ভাবছিস, আবার শুভকে
নিয়ে ভাবছিস। এত কিসের ভাবাভাবি? আমরা সবাই রাজা।'

'আচ্ছা যা, আব ভাবব না।'

'না ভেবে তুই পারবি না। ব্যাপারটা রক্তের মধ্যে ঢুকে আছে।'

আনুশকা বলল, জানালা পুরোটা খোলা না রেখে হাফ খুলে রাখ। তুই একেবাবে
গোসল করে ফেলেছিস।

জরী জানালা বন্ধ করে উঠে দাঁড়াল। আনুশকা বলল, যাচ্ছিস কোথায়?

'অন্য কোথাও গিয়ে বসব। যেখানে আমার যাত্সম কেউ থাকবে না। কেউ
আমাকে ক্রমাগত উপদেশ দেবে না।'

'স্যারি। এখানেই বোস। জানালা পুরোপুরি খুলে দে। আমি আব কিছু বলব না।
ওয়ার্ড অব অনার।'

'না, তোর পাশে বসব না।'

জরী হাঁটতে শুরু করল। দলের পুরুষদের মধ্যে শুধু মোতালেবকে দেখা যাচ্ছে।
সে ইতিমধ্যে শোবার ব্যবস্থা করে ফেলেছে। তার পাশের সীটের স্তরলোককে অন্য
জায়গায় পাঠিয়ে দুটা সীট দখল করে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়েছে। দূর থেকে দেখলেই
বোঝা যায় সে গভীর ঘুমে আচ্ছম। অথচ কথা ছিল সারা রাত কেউ ঘুমুবে না।
জরীর মনে হল — শেষটায় দেখা যাবে শুধু সেই জেগে আছে, আব সবাই ঘুমে।
কামবায় গাড়িভরা ঘুম, রজনী নিঘুম।

রাত কত হয়েছে? জরীর হাতে ঘড়ি ছিল। এখন ঘড়ি নেই। কোথাও খুলে-ঢুলে
পড়ে গেছে। ভালই হয়েছে। ঘড়িটা ঐ মানুষের দেয়া। দামি ঘড়ি। লোকটা কঢ়ে না।
সে তার স্ত্রীকে দামি-দামি জিনিসপত্র দিয়েই সাজিয়েছে। পরনের শাড়িও দামি।
কত দাম জরী জানে না। লোকটার বোন এই শাড়ি তাকে পরাতে পরাতে বলেছিল,
বেস্ট কোয়ালিটি, বালুচরি কাতান।

সেই বেস্ট কোয়ালিটি বালুচরি কাতান ভিজে এখন গায়ের সঙ্গে লেপ্টে আছে।
জরীর এখন নিজেকে অশুচি লাগছে। মনে হচ্ছে, ঐ লোকটা যেন তাকে জড়িয়ে
ধরে আছে।

একজন সাধারণ মেয়ের জীবনেও কত অঙ্গুত ঘটনা ঘটে! জরী কি নিজেই
ভেবেছিল সে এমন একটা কাণ্ড করতে পারবে? বিয়ের আসর থেকে পালিয়ে
আসবে?

যদি পালাতে না পারত তা হলে কী হত? তা হলে এই রাতটা হত তাদের
বাসরঠাত। লোকটা তার শরীর নিয়ে কিছুক্ষণ ছানাছানি করে সিগারেট খেয়ে ঘুমিয়ে
পড়ত। আব সে সারা রাত জেগে বৃষ্টি দেখত। আচ্ছা, ঢাকায় কি এখন বৃষ্টি হচ্ছে?

ଏ ଲୋକଟା କୀ କରଛେ? ସୁମୁତେ ନିଶ୍ଚଯଇ ପାରଛେ ନା । କିଂବା କେ ଜାନେ ମଦ-ଫଦ ଖେଯେ ହୟତୋ ନାକ ଡାକିଯେ ସୁମୁଚେ । ତବେ ସେଇ ସୁମ ନିଶ୍ଚଯଇ ସୁଖେର ସୁମ ନା । ନିଶ୍ଚଯଇ ସୁମେର ମଧ୍ୟେ ତାର ଶରୀର ଜୁଲେ ଯାଚେ ।

ଶୁଭ୍ର ଲକ୍ଷ କରଲ, ଭେଜା ଶାଢ଼ିର ଏକ ଅଂଶ ଚାଦରେର ମତୋ ଗାୟେ ଜଡ଼ିଯେ ଜରୀ ହନ-ହନ କରେ ଯାଚେ । ତାର ଏକବାର ଇଚ୍ଛା ହଲ ଜରୀକେ ଡାକେ । କିନ୍ତୁ ଜରୀର ହାଁଟାର ମଧ୍ୟେ ଏମନ ଏକ ଆତ୍ମମୟ ଭଙ୍ଗି ଯେ, ମନେ ହୟ ଡାକଲେଓ ମେ ଥାମବେ ନା । ଏକଟା ସୁଟ୍ଟକେସେର ସଙ୍ଗେ ଧାକା ଖେଯେ ଜରୀର ପଡ଼େ ଯବାର ମତୋ ହଲ । ମେ ନିଜେକେ ସାମଲେ ନିଯେ ହାସଲ । କାର ଦିକେ ତାକିଯେ ହାସଲ ?

ଶୁଭ୍ର ହାତେ ଏକଟା ଜ୍ଵଳନ୍ତ ସିଗାରେଟ । ଆଜ ଏକ ରାତରେ ମଧ୍ୟେ ଅନେକଗୁଣ ସିଗାରେଟ ଖାଓୟା ହୟେଛେ । ବମ୍ବ-ବମ୍ବ ଲାଗଛେ, ସୁକ ଜ୍ଵଳା କରଛେ ଏବଂ ମାଥା କେମନ ହାଲକା ଲାଗଛେ । ଏଇ ହାଲକା ବୌଧ ହେୟାଟାଇ କି ସିଗାରେଟେର ନେଶା? ଗାଜା ଖେଲେ ଲଞ୍ଜା ବାଡ଼େ, ଭାଂ-ଏର ସରବତ ଖେଲେ କୀ ହୟ ଏଖନୋ ଜାନା ହୟନି ।

‘ସ୍ୟାର, ଏକଟୁ ଶୁନବେନ ?’

ଶୁଭ୍ର ଚମକେ ଉଠେ ବଲଲ, ଆମାକେ ବଲଛେନ ?

‘ହୁଁ, ଆପନାକେଇ ବଲଛି ।’

ଅପରିଚିତ ଏକଜନ ମାନୁଷ । ଲମ୍ବା, ବୋଗା । ମାଥାଯ ଚୁଲେର ବଂଶ୍ଵ ନେଇ । ପରନେ ସାଫାରି । ମେଯେଲି ଗଲାର ସ୍ଵର । ଚୋଖେ ସୋନାଲି ଫ୍ରେମେର ଚଶମା । ଏଇ ଲୋକକେ ଆଗେ କଥନୋ ଦେଖେଛେ ବଲେ ଶୁଭ୍ର ମନେ କରତେ ପାରଲ ନା ।

‘ଆମି କି ଆପନାକେ ଚିନି ?’

‘ହୁଁ ନା ସ୍ୟାର ।’

‘ଆପନି ଆମାକେ ଚେନେନ ?

‘ହୁଁ ସ୍ୟାର, ଚିନି । ଆପନାର ବାବା ହେଇଅଟିଦିନ ସାହେବ ଆମାକେ ପାଠିଯେଛେନ ।’

‘ବୁଝାତେ ପାରଛି ନା । ତିନି ଆପନାକେ ହଠାତ୍ କରେ କୀଭାବେ ପାଠାବେନ ?’

‘ଆପନାର ଦେଖାଶୋନା କରାର ଜନ୍ୟେ ଆମି ଢାକା ଥେକେଇ ଗାଡ଼ିତେ ଉଠେଛି ।’

ଶୁଭ୍ର ଶୁକଳେ ଗଲାଯ ବଲଲ, ଓ ଆଜ୍ଞା । ତା ହଲେ ଆପନି ଠିକମତିଇ ଦେଖାଶୋନା କରେ ଯାଚେନ ? ବାବାକେ ଖର ପାଠାଚେନ କୀଭାବେ, ଓସ୍ୟାରଲେସେ ?’

‘ସ୍ୟାର, ଆପନି ଶୁଦ୍ଧ ଶୁଦ୍ଧ ଆମାର ଉପର ରାଗ କରଛେନ ।’

‘ଆମି ଆପନାର ଉପର ରାଗ କରଛି ନା, ରାଗ କରଛି ବାବାର ଉପର । ଆମି କଳ୍ପନାଓ କବିନି ବାବା ଏକଜନ ସ୍ପାଇ ପାଠାବେନ ।’

‘ସ୍ୟାର, ଆପନି ଭୁଲ କରଛେନ । ଆମି ସ୍ପାଇ ନା, ଆପନାର ଯାତେ କୋନୋ ଅସୁବିଧା ନା ହୟ ସେଜନ୍ୟଇ ଆମି ଯାଛି । ଆମାକେ ବଲା ହୟେଛେ, ବଡ଼ ବକମ୍ବେର କୋନୋ ସମସ୍ୟାଯ ପଡ଼ଲେଇ ଶୁଦ୍ଧ ଆପନାକେ ଆମାର ପରିଚୟ ଦିତେ ।’

শুভ যন্ত্র-খারাপ-করা গলায় বলল, আমি কি বড় রকমের কোনো সমস্যায়
পড়েছি?

‘জি স্যার, পড়েছেন।’

‘আমি তো কোনো সমস্যা দেখছি না।’

‘আপনার ঘূমের অসুবিধা হচ্ছে।’

‘আমার ঘূমের অসুবিধা একটা বড় ধরনের সমস্যা। আপনি আমার ঘূমের
ব্যবস্থা করেছেন?’

‘জি।’ তিনটা এয়ার কন্ডিশান্ড কোচ আপনার নামে রিজার্ভ করা আছে। খালি
যাচ্ছে। আপনারা ঘুমাতে পারেন।’

‘আমি তার কোনো প্রয়োজন দেখছি না।’

‘সারা রাত জেগে থেকে পরদিন জানি করলে অসুস্থ হয়ে পড়বেন স্যার।
অপনার শরীর তো ভাল না।’

‘যদি অসুস্থ হয়ে পড়ি আপনি নিশ্চয়ই ডাক্তারের ব্যবস্থাও করে ফেলবেন।
কাজেই আমি কোনো সমস্যা দেখছি না।’

‘আপনি স্যার শুধু শুধু আমার উপর রাগ করছেন। আমি হৃকুমের চাকর।’

‘আমি আপনার উপর রাগ করছি না। তবে আবার যদি কখনো আপনাকে
আমার পেছনে ঘূরঘূর করতে দেখি তা হলে রাগ করব। খুব রাগ করব। আপনার
নাম কী?’

‘স্যার, আমার নাম সুলেমান।’

‘সুলেমান সাহেব! আপনি দয়া করে বিদায় হোন। আমাকে আমার মতো
থাকতে দিন।’

‘জি আচ্ছা, লাইটারটা রাখুন স্যার।’

‘লাইটার দিয়ে কী করব?’

‘আপনার সিগারেট নিভে গেছে।’

শুভ লাইটার হাতে নিজের জ্বায়গায় ফিরে এল। আনুশকা বলল, শুভ, তুমি কি
জরীকে দেখেছ? সে কোথায় জান?’

‘এখন কোথায় জানি না। তবে তাকে যেতে দেখেছি। হনহন করে যাচ্ছিল।
একটা স্যুটকেসের সঙ্গে ধাক্কা খেয়েছে।’

‘ও আমার উপর রাগ করে উঠে চলে গেছে।’

‘কী নিয়ে রাগ করল?’

‘কোনকিছু নিয়ে না। রাগটা ওর মনে ছিল। বের হয়ে এসেছে। তুমি কি রাগ
ভাঙিয়ে ওকে নিয়ে আসবে?’

‘আমি গেলে ওর রাগ ভাঙবে?’

‘হ্যা, ভাঙবে।’

শুভ্র জরীকে খুঁজতে বের হল। আশচর্য কাও! জরী কোথাও নেই। একজন মানুষ তো হাওয়ায় মিলিয়ে যেতে পারে না! কোথায় গেল সে? আখাউড়ায় টেন কিছুক্ষণের জন্যে থেমেছিল। জরী কি তখন নেমে গেছে? শুভ্র বুক কঁপছে। সে আবার খুঁজতে শুরু করল।

‘স্যার, আপনি কি কাউকে খুঁজছেন?’

‘না, কাউকে খুঁজছি না। আপনাকে না বলেছি আমার পেছনে ঘূরঘূর করবেন না?’

সুলেমান এসে সামনে দাঁড়িয়েছে। সে কি হায়ার মতো শুভ্রকে অনুসরণ করছে?

সুলেমান ইতস্তত করে বলল, ‘ভেজা শাড়িপরা মেয়েটি স্যার বুফে কারে আছে।’

‘ও আচ্ছা, থ্যাংক যু। আপনি কি সারাক্ষণই আমার পেছনে পেছনে আছেন?’

‘আমি স্যার দূর থেকে লক্ষ রাখছি।’

‘আমি কী করছি না করছি সব দেখছেন?’

‘জ্ঞি স্যার।’

‘আমি যে বুফে কারের ম্যানেজারের গায়ে খুখু দিয়েছি, তাও দেখেছেন?’

সুলেমান কিছু বলল না। সে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। শুভ্র একবার ভাবল বলে, এই ব্যাপারটা আপনি দয়া করে বাবাকে বলবেন না। তারপর মনে হল, এটা বলা ঠিক হবে না। অন্যায় অনুরোধ। অন্যায় অনুরোধ আর যে-ই করুক, সে করতে পারে না।

বুফে কার অঙ্ককার। টেবিলগুলির উপর বালিশ এবং চাদর বিছিয়ে বুফে কারের লোকজন শুয়ে আছে। একটি টেবিলই শুধু খালি। তারই এক কোণায় জড়সড় হয়ে জরী বসে আছে। খোলা জানালায় বৃষ্টির ছাঁটি আসছে।

শুভ্র ডাকল, জরী!

জরী খুব স্বাভাবিক গলায় বলল, এসো। বসো আমার সামনে।

‘একা একা কী করছ?’

‘ভাবছি।’

‘কী ভাবছ?’

‘শৈশব থেকে ভাবা শুরু করেছি। চার বছর বয়স থেকে আরম্ভ করেছি, যেসব

স্মৃতি মাথায় জমা আছে সেগুলি দেখার চেষ্টা করছি।'

'কোন পর্যন্ত এসেছ?'

'ফ্লাস টেন। ফ্লাস টেনে এসেই বাধা পড়ল। তুমি উদয় হলে।'

'শীত লাগছে না?'

'লাগছে। শীতে মরে যাচ্ছি। মনে হয় জ্বরও এসেছে। দেখো তো, গায়ে জ্বর আছে কি না।'

জরী হাত বাড়িয়ে দিল। কত সহজেই না সে তার হাত বাড়িয়েছে। দ্বিতীয় নেই, সংকোচ নেই। বরং একধরনের নির্ভরতা আছে।

শুভ্র বলল, তোমার গায়ে জ্বর।

'বেশি জ্বর?'

'হ্যাঁ, বেশি। অনেক জ্বর। তোমার বৃষ্টিতে ভেজা ঠিক হয়নি।'

'বৃষ্টিতে না ভিজলেও আমার জ্বর আসত। আমি যখন বড় ধরনের কোনো সমস্যা থেকে মুক্তি পাই, তখন আমার জ্বর এসে যায়।'

'সেই জ্বর কতদিন থাকে?'

'সে হিসাব করিনি।'

'ভেজা কাপড় বদলাবে না?'

'বদলাতে পারলে ভাল হত। নিজেকে অশুচি লাগছে, তবে নোংরা বাথরুমে ঢুকে কাপড় বদলাতে ইচ্ছে করছে না।'

'তা হলে কী করবে? ভেজা কাপড়ে বসে থাকবে?'

'হ্যাঁ।'

'আনুশঙ্কা ঘন-খারাপ করে আছে। তুমি নাকি তার সঙ্গে ঝগড়া করেছ?'

জরী কিছু বলল না। জানালার অন্দরারের দিকে মুখ ঘূরিয়ে বসল। বৃষ্টি থেমে গেছে। আকাশে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। জরী হাই তুলতে তুলতে বলল, প্রচণ্ড ঘূম পাচ্ছে। ইস, একটা পুরো কামরা যদি আমার একার থাকত, তা হলে দরজা বন্ধ করে হাত-পা ছড়িয়ে কী আরাম করে ঘুমুতাম!

শুভ্র ইতস্তত করে বলল, আমি একটা খালি কামরার ব্যবস্থা করতে পারি।
করব?

'একটা পুরো কামরা শুধু আমার জন্যে?'

'হ্যাঁ।'

'কীভাবে করবে?'

'কীভাবে করব তা তোমার জানার দরকার নেই। করব কি না সেটাই জানতে চাচ্ছ।'

‘পীজ শুভ, করো। কীভাবে করবে?’
‘ম্যাজিক। বড়লোকদের হাতে অনকে ধরনের ম্যাজিক থাকে।’

শুভ বুফে কারের বাইরে এসে দেখে, সুলেমান মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে। সুলেমান মনে হল শুভকে দেখে লজ্জা পাচ্ছে। সে চলে যেতে ধরেছিল, শুভ বলল, একটা কামরার ব্যবস্থা করুন।

সুলেমান হতভম্ব গলায় বলল, আপনাদের দু'জনের জন্যে?
‘না, একজন শুধু যাবে। তার শরীর খারাপ।’
‘ও আচ্ছা। আমি স্যার, ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।’
‘ভয় পাবার কিছু নেই।’
‘একজন ডাক্তারের ব্যবস্থা কি স্যার করব?’
‘আপনি কি ডাক্তারও সঙ্গে নিয়ে এসেছেন?’
‘জি না স্যার। খুঁজে বের করব। এত বড় টেন, একজন-না-একজন ডাক্তার তো থাকবেনই। ডাক্তার কি লাগবে স্যার?’
‘না।’
‘আমার ব্যবহারে অসম্ভূষ্ট হবেন না স্যার।’
শুভ বিশ্বিত হয়ে তাকাল। লোকটাকে এখন আর তার এত খারাপ লাগছে না।
কী রকম বিনীত ভঙ্গিতে তাকাচ্ছে।



ଟ୍ରେନ ଏସେ ଚାଟଗାଁଯେ ଥାମଲ ଭୋର ପାଂଚଟାଯା। ଚାରଦିକ ଅନ୍ଧକାର। ଭୋରେର କୋନୋ ଆଭାସ ଦେଖା ଯାଛେ ନା। ପ୍ଲ୍ୟାଟଫର୍ମେର ଆଲୋ କାମରାୟ ତୁକରେ। ଏହି ଆଲୋଟୁକୁଇ ଭରସା, କାରଣ, ଟ୍ରେନ ପ୍ଲ୍ୟାଟଫର୍ମେ ଢୋକାର ପ୍ରାୟ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଟ୍ରେନେର ସବ ବାତି ନିଭିଯେ ଦେଯା ହେଁବେ।

ରାନାର ହାତେ ଏକଟା ପେନସିଲ-ଟର୍ଚ। ପ୍ରଯୋଜନେର ସମୟ କୋନୋ ଜିନିସଟି କାଜ କରେ ନା। ରାନାର ପେନସିଲ-ଟର୍ଚଓ କାଜ କରଛେ ନା। ବୋତାମ ଟିପେ ଟିପେ ତାର ହାତ ବ୍ୟଥା ହେଁବେ। ଅର୍ଥଚ ଏହି ପେନସିଲ-ଟର୍ଚ ରାନା ହବାର ଆଗେର ଦିନ କେନା ହେଁବେ। ରାନା ଉଚ୍ଚ ଗଲାଯ ବଲଲ, କେଉ ଟ୍ରେନ ଥେକେ ନାମବେ ନା, ଆନଟିଲ ଫାର୍ଡାର ଅର୍ଡାର। ଯେ ଯେଥାନେ ଆହୁ ମେଖାନେଇ ଥାକ। ମାଲେର ଦିକେ ଲକ୍ଷ ବାଖୋ। ନୋ ମୁଭମେଟ୍।

ଆନୁଶକା ବଲଲ, ଖାମାଖା ଚିତ୍କାର କୋରୋ ନା ତୋ। ଶୁଦ୍ଧ ଶୁଦ୍ଧ ହୈଚେ କରଇ କେନ ?

‘ଶୁଦ୍ଧ ଶୁଦ୍ଧ ହୈଚେ କରଇ ? ବାତି ନେଇ କିଛୁ ନେଇ, ଏର ମଧ୍ୟେ ଏକଟା-କିଛୁ ଯଦି ହେଁ ?’

‘କୀ ହବେ ?’

‘ଅନେକ କିଛୁଇ ହତେ ପାରେ। ଜରୀ କୋଥାଯ ? ଜରୀକେ ତୋ ଦେଖଇ ନା !’

‘ରାନା, ତୋମାର ଆଲଗା ମାତ୍ରବରି ଅସହ୍ୟ ଲାଗଛେ।’

‘ଅସହ୍ୟ ଲାଗଲେଓ କିଛୁ କରାର ନେଇ। ସହ୍ୟ କରେ ନିତେ ହବେ। ଜରୀ କୋଥାଯ ?’

ଶୁଦ୍ଧ ବଲଲ, ଜରୀ ଅନ୍ୟ କାମରାୟ ସୁମୁଛେ। ତାର ଶରୀର ଭାଲ ନା।

ରାନା ରାଗୀ ଗଲାଯ ବଲଲ, ଅନ୍ୟ କାମରାୟ ସୁମୁଛେ ମାନେ ? କେ ଡିସିଶାନ ଦିଲ ? ଆମି କିଛୁଇ ଜାନି ନା, ଆର ଦଲେର ଏକଜନ ମେସ୍ତାର ଅନ୍ୟ କାମରାୟ ଚଲେ ଗେଲ ।

ଆନୁଶକା ବଲଲ, ଚିତ୍କାର ବଞ୍ଚ କରୋ ତୋ ରାନା ! ଯଥେଷ୍ଟ ଚିତ୍କାର ହେଁବେ। ତୁମି ପ୍ଲ୍ୟାଟଫର୍ମେ ଦାଁଡ଼ିଯେ ସିଗାରେଟ ଟାନେ। ଇତିମଧ୍ୟେ ଭୋର ହବେ। ଆମରା ନାମବ ।

‘ଦଲେର ଭାଲମନ୍ଦ ଆମି ଦେଖବ ନା ?’

‘ତୋମାକେ କିଛୁ ଦେଖିତେ ହବେ ନା। ଅନେକ ଦେଖେଇ !’

ରାନା ରାଗ କରେ ଟ୍ରେନ ଥେକେ ନେମେ ଗେଲ । ନାମାର ସମୟ ନଇମାର ପା ମାଡିଯେ ଦିଯେ ଗେଲ । ବ୍ୟାପାରଟା ଅନିଚ୍ଛାକୃତ । କିନ୍ତୁ ନଇମାର ଧାରଗା, ରାନା ଏହି କାଜଟା ଇଚ୍ଛା କରେଇ କରେଛେ । ନଇମା ଅଳ୍ପତେଇ କାତର ହେଁ । ପାଯେର ବ୍ୟଥାୟ ମେ କାତରାଛେ । ନୀରା ବଲଲ,

তুই এমনভাবে চিৎকার করছিস, তাতে মনে হচ্ছে হাঁটুর নিচ থেকে তোর পা খুলে
পড়ে গেছে।

‘ব্যথা পেলে চিৎকার করব না?’

‘এমন কিছু ব্যথা পাসনি যে ট্রেনের সব মানুষকে সেঁটা জানাতে হবে।’

‘খামাখা ঝগড়া করছিস কেন? পায়ের চামড়া খুলে গেছে — আর . . .’

‘তোর এত নরম চামড়ার পা তুই ফেলে ছড়িয়ে বসে আছিস কেন? কোলে
নিয়ে বসে থাকলেই হত।’

নইমা কোনো কথা না বলে উঠে দাঁড়াল। পায়ে স্যাব্ডেল পরল। আনুশক্ত
বলল, যাচ্ছিস কোথায়? নইমা বলল, দ্যাটস নান অব ইয়োর বিজনেস।

নইমা ট্রেন থেকে নেমে গেল। সে হাঁটিতে শুরু করেছে ওভারব্রিজের দিকে।

জরীর খুব ভাল ঘূম হয়েছে। এসি দেয়া স্লীপিং বার্থের ব্যবস্থা ভাল। শুধু কামরাটা
বেশি ঠাণ্ডা। কামরার অ্যাটেনডেন্ট বালিশ এবং কম্বল দিয়েছে। একা একটা
কামরার দরজা বন্ধ করে ঘুমানোর আলাদা আনন্দ আছে। জরী অনেকদিন পর খুব
আরাম করে ঘুমল। মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখল — সেইসব স্বপ্নও আনন্দময় স্বপ্ন।
ভয়ংকর কোনো দৃঢ়স্বপ্ন নয়।

এখন ট্রেন থেমে আছে। চিটাগাং এসে গেছে এটা সে বুঝতে পারছে। তার
পরেও বিছানা ছেড়ে উঠতে হচ্ছা করছে না। জীবনের আনন্দময় সময়ের একটি
হচ্ছে ঘুম-ঘুম ভাব নিয়ে শুয়ে থাকা।

দু'বার টোকা পড়ল দরজায়। জরী বলল, কে?

‘আমি। আমি শুন্দ। আমরা এসে গেছি।’

জরী পাশ ফিরতে ফিরতে বলল, ও, আচ্ছা।

শুন্দ বলল, এখন আমরা নামব।

জরী হাই তুলতে তুলতে বলল, আমি আরো খানিকক্ষণ শুয়ে থাকতে চাই
শুন্দ। এই ধরো, পাঁচ মিনিট।

‘তোমার গায়ে কি জ্বর আছে?’

‘বুঝতে পারছি না। মনে হয় আছে। শুন্দ, তুমি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থেকো
না। তুমি নেমে যাও। আমি নিজে নিজেই নামব।’

‘আচ্ছা। রাতে তোমার কি ভাল ঘূম হয়েছে?’

‘খুব ভাল ঘূম হয়েছে।’

রানার মাথায় রক্ত উঠে গেছে। মাথায় রক্ত ওঠার মতো অনেকগুলি কারণের

একটি হচ্ছে নইমা ট্রেন থেকে নেমে কোনোদিকে না তাকিয়ে সোজা ওভারব্রিজে
উঠে গেছে। রানার একবার ইচ্ছা করছিল, ডেকে জিজ্ঞেস করে — যাচ্ছ কোথায়?
শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞেস করেনি। কী দরকার? যাক যেখানে ইচ্ছা। তার দায়িত্ব কী? সে
আগ বাড়িয়ে কিছু বলতে গেলে সবাই রেগে যায়। কী দরকার সবাইকে রাগিয়ে? হ
কেয়ারস? গো টু হেল।

রানা খানিকক্ষণ নির্বিকার থাকতে চেষ্টা করেছে। শেষটার রওনা হয়েছে খোঁজ
নিতে। ওদের ভাল লাগুক বা না লাগুক, খোঁজ তো রাখতেই হবে। রানা পুরো
স্টেশন খুঁজে এল। নইমা নেই। কোনো মানে হয়? জুলজ্যান্ত একটা মেয়ে তো
হারিয়ে যেতে পারে না বা বাতাসেও মিলিয়ে যেতে পারে না। হয়েছেটা কী?
আনুশকাকে ঘটনাটা জানানো দরকার। সে শুনে হয়তো এমন কিছু বলবে, যাতে
আবার মাথায় রক্ত উঠে যাবে।

রানা আনুশকাদের কামরার জানালার কাছে এসে দাঁড়াল। আনুশকা বলল, কিছু
বলবে?

‘নইমা কোথায়?’

‘প্ল্যাটফর্মে নেমেছে।’

‘আমি তো কোথাও দেখলাম না।’

আনুশকা হাই তুলতে তুলতে বলল, আছে কোথাও। ব্যস্ত হবার কিছু নেই।

‘একটা মেয়ের কোনো “ট্রেস” নেই আর আমি ব্যস্ত হব না?’

‘ট্রেস থাকবে না কেন? ট্রেস ঠিকই আছে। তুমি খুঁজে পাছ না।’

রানা রাগ সামালাতে একটু দূরে সরে গেল। সিগারেট ধরাল। আর তখন দুজন
পুলিশকে এগিয়ে আসতে দেখল। তাদের মধ্যে সাদা পোশাকের একজন। সেও যে
পুলিশের তা বোৰা যাচ্ছে। তারা থমকে দাঁড়াল। সাদা পোশাকপরা লোকটি এগিয়ে
এল।

‘আপনি কি ঢাকা থেকে আসছেন?’

‘ছি।’

‘কয়েকজনের একটা পিকনিক পাটি?’

‘ছি।’

‘চারটি মেয়ে আছে আপনাদের দলে?’

‘ছি।’

‘ওদের একজনের নাম জরী?’

‘ছি।’

‘আপনাদের সবাইকে থানায় যেতে হবে।’

‘কী বললেন?’

‘আপনাদের থানায় যেতে হবে।’

‘কেন?’

‘ঢাকা থেকে ম্যাসেজ এসেছে, আপনারা মনিরুজ্জামান সাহেবের স্ত্রীকে জোর করে ধরে নিয়ে চলে এসেছেন।’

‘কী বলছেন এসব?’

‘আমাদের কাছে ইমফরমেশন যা আছে তাই বলছি।’

রানার হাতের সিগারেট নিতে গেছে। সে নেভা সিগারেটই টানছে। তার মাথা ভেঁ ভেঁ করছে। এ কী সমস্যা! এই সমস্যায় উক্তাবের পথ কী? পুলিশের সঙ্গে প্রতিটি কথা মেপে বলতে হয়। বিচার-বিবেচনা করে বলতে হয়। যাথায় কোনো বুদ্ধি, কোনো বিচার-বিবেচনা আসছে না। বরং হঠাতে প্রচণ্ড বাথরুম পেয়ে গেছে। মনে হচ্ছে, এই মুহূর্তে বাথরুমে ছুটে না গেলে সমস্যা হয়ে যাবে। প্যান্ট ভিজে কেলেক্ষারি হবে। রানা ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলল, স্যার, আপনারা ঠিক বলছেন?

সাদা পোশাকের অদ্রলোক গন্তির গলায় বললেন, আমরা ঠিক বলছি না ভুল বলছি তার বিবেচনায় আপনাকে যেতে হবে না। আমরা যে খবর পেয়েছি সেই হিসাবে কাজ করছি। আপনাদের বিরুক্তে অভিযোগ গুরুতর। একজনের বিবাহিতা স্ত্রীকে ভাগিয়ে নিয়ে চলে এসেছেন।

‘খবরটা সত্য না স্যার। বিয়ে হয়নি।’

‘আপনাদের খবরের উপর আমরা নির্ভর করি না। আমরা খবর পেয়েছি অনেক উপরের লেভেল থেকে।’

‘ও, আচ্ছা।’

‘মিসেস মনিরুজ্জামান কি আপনাদের সঙ্গে আছেন?’

‘জি স্যার।’

‘মিসেস মনিরুজ্জামান যে আপনাদের সঙ্গে আছেন তা তো আপনারা একবাক্যেই স্থীকার করলেন। তার পরেও বলছেন — ভুল বলছি?’

‘স্যার, আপনারা এখানে দাঁড়ান, আমি জরীকে নিয়ে আসছি।’

‘শুধু তাকে আনলে হবে না। আপনাদের সবাইকে আমাদের সঙ্গে যেতে হবে। আপনারা যে কত বড় যন্ত্রণায় পড়েছেন সে সম্পর্কে আপনাদের কোনো ধারণা নেই। আপনার সিগারেট নেভা। আপনি নেভা সিগারেট টানছেন।’

রানা বলল, স্যার, সিগারেট খাবেন?

‘না, সিগারেট খাব না।’

আকাশ ফর্সা হতে শুরু করেছে। টেনের লোক সবাই প্রায় নেমে এসেছে। রানা কাঁপা পায়ে কামরায় উঠল। আনুশকার সঙ্গে কথা বলা দরকার। তারও আগে বাথরুমে যাওয়া দরকার। কথা নেই বার্তা নেই হঠাৎ বাথরুম পেয়ে গেছে। একেই বলে শিকারের সময় কৃতার ল্যাট্রিন।

‘আনুশকা, একটু নিচে নেমে আসো। খুব জরুরি কথা আছে। এক্সট্রিম ইমার্জেন্সি।

‘নইমাকে এখনো পাওয়া যায়নি?’

‘নইমা-টইমা বাদ। অন্য ব্যাপার। সর্বনাশ হয়ে গেছে।’

‘অল্পতে অস্থির হয়ে না তো রানা। তোমার কি ব্লাডপ্রেশারের কোনো সমস্যা আছে? হাত কাঁপছে কেন?’

কঠিন কিছু কথা রানার মুখে এসেছিল। নিজেকে সামলে নিয়ে সে সহজ ভঙ্গিতেই ব্যাপারটা আনুশকাকে বলল। নিচু গলায় বলল, অন্যদের শোনার এখন কিছু নেই। আনুশকার কোনো ভাবান্তর হল না। সে সহজ ভঙ্গিতেই এগিয়ে গেল। সাদা পোশাকের পুলিশ বলল, আপনিই কি মিসেস মনিকুজ্জামান?

‘আমার নাম আনুশকা। মিসেস মনিকুজ্জামানকে আমি চিনি না।’

‘আপনাদের আমার সঙ্গে থানায় যেতে হবে।’

‘কোনো ওয়ারেন্ট আছে?’

‘পুলিশ যদি থানায় যেতে বলে তা হলে যেতে হয়। পুলিশের কাজে বাধা দিলে অ্যারেন্ট করা কোনো ব্যাপার না।’

আনুশকা সহজ গলায় বলল, আপনাদের পেছনে কি কোনো বড় কর্তাব্যস্তি আছে?’

‘হ্যাঁ, আছে।’

‘আপনার হাতে কি ওয়াকিটকি?’

‘হ্যাঁ।’

‘আমার পরিচয় কি আপনি জানেন?’

‘অকারণ কথা বলে আপনি আমাদের সময় নষ্ট করছেন।’

‘আমার পরিচয় জানতে পারলে আপনার হাত থেকে ওয়াকিটকি মাটিতে পড়ে যাবে। কাজেই আমি অকারণ কথা বলছি না। বাথের উপর যে থাকে তার নাম টাগ। তিমির উপর তিমিঙ্গল। আপনি কিছু জানেন না বলেই এমন কড়া গলায় আমার সঙ্গে কথা বলার দুঃসাহস দেখাচ্ছেন।’

পুলিশ অফিসার হকচকিয়ে গেল। সমস্যা এদিকে দিয়ে আসবে ভাবা যায়নি। এ দেখি আরেক যন্ত্রণায় পড়া গেল ! আনুশকা বলল, আপনি কি অতি দ্রুত ঢাকার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবেন ?

‘অবশ্যই পারব।’

‘তাহলে দয়া করে আমার হয়ে একটা ইনফরমেশন ঢাকায় পাঠাবার ব্যবস্থা করুন। পুলিশের আইজি-কে খবর পাঠাতে হবে। আনুশকা নামের একটা মেয়েকে পুলিশ বিবর্জন করছে। নুরুদ্দিন সাহেব আমার ছেট মামা।’

‘ও, আছা।’

‘আপনার কি বিশ্বাস হচ্ছে না ?’

‘বিশ্বাস না হবার কী আছে ? মানে আপা, সমস্যাটা হল . . .’

‘কোনো সমস্যা হয়নি। বরং আমাদের একটা সমস্যা হয়েছে। আমাদের এক বাস্তবী — নহমা তার নাম। নইমাকে পাছ্ছি না। প্ল্যাটফরমেই আছে। ওকে দয়া করে একটু খুঁজে বের করে দিন।’

পুলিশের দলটা খানিকক্ষণ কোনো কথা বলল না। আনুশকা বলল, রানা, এসো তো, জিনিসপত্র নামাতে হবে। চা খাবার ব্যবস্থা করতে হবে। সকালবেলা চা না খেলে আমার মাথা ধরে যায়। রানা ফিসফিস করে বলল, আইজি নুরুদ্দিন সাহেব তোমার মামা ? আনুশকা বলল, আরে দূর ! পুলিশে আমার কোনো আত্মীয়স্বজন নেই। কিছুক্ষণের জন্যে ওদের পিলে চমকে দিয়েছি। এরা খোঁজখবর করবে। এই ফাঁকে আমরা কেটে পড়ব।

‘আমার কিন্তু যোটেই ভাল লাগছে না।’

‘আমার লাগছে। অ্যাডভেঞ্চার-অ্যাডভেঞ্চার ভাব হচ্ছে।’

আনুশকা খিলখিল করে হেসে ফেলল।

‘হাসছ কেন ? হোয়াই লাফিং ?’

‘তুমি বড় বিবর্জন করছ রানা। পুলিশের চেয়েও বেশি বিবর্জন করছ ? শান্ত হও — শান্ত !’

‘শান্ত হব ?’

আনুশকা আবারো শব্দ করে হাসল। রানা চাপা নিঃশ্বাস ফেলল। পৃথিবীতে মেঘজাতটার সৃষ্টি কেন হল, সে ভেবে পাচ্ছে না।



ইয়াজউদ্দিন সাহেবের ঘুম ভাঙল টেলিফোনের শব্দে। টেলিফোন ধরার আগে তিনি ঘড়ি দেখলেন। ভোর ৬টা ৪০ মিনিট। এত ভোরে টেলিফোন! কোনো কি সমস্যা হয়েছে? তিনি টেলিফোন ধরলেন।

‘স্যার, আমি সুলেমান।’

‘ভাল আছ সুলেমান?’

‘জি স্যার।’

‘বলো কী বলবে।’

‘ছোট সাহেবের বিষয়ে কথা বলব।’

‘বলো, আমি শুনছি।’

‘ওনারা স্যার চিটাগাং পৌছেছেন।’

‘ভাল কথা। ঢাকা থেকে যখন রওনা হয়েছে তখন চিটাগাং তো পৌছবেই। এছাড়া কোনো খবর আছে?’

‘একটু সমস্যা হচ্ছে স্যার।’

‘তুমি ভেঙে ভেঙে না বলে একনাগাড়ে বলে যাও। কী ব্যাপার?’

‘পুলিশ বামেলা করছে। সকালবেলা একদল পুলিশ এসে উপস্থিত — উনারা নাকি কার স্ত্রীকে ভাগিয়ে নিয়ে এসেছেন। ভদ্রমহিলার স্বামী মামলা করেছেন। উনার কানেকশন ভাল। উপরের লেভেল থেকে চাপ আসছে।’

‘আর কিছু?’

‘জি না স্যার, আর কিছু না।’

‘ওদের কি থানায় নিয়ে গেছে?’

‘থানায় নিয়ে যায়নি, তবে নিয়ে যাবে বলে মনে হয়।’

‘শুভ কেমন আছে?’

‘জি, ভাল আছেন।’

‘ও এই ঘটনায় নার্ভাস হয়নি?’

‘উনি এইসব ব্যাপারে এখনো কিছু জানেন না।’

‘ওর চোখে কি চশমা দেখেছ?’

‘জি।’

‘ভেরি গুড। তুমি আরো কিছু বলবে, না টেলিফোন রেখে দেব?’

‘আমাকে কিছু করতে বলছেন স্যার?’

‘না, কিছু করতে বলছি না। তুমি শুধু লক্ষ রাখো।’

‘জি আচ্ছা স্যার।’

‘টেলিফোন তা হলে রাখি?’

‘স্যার, আরেকটা খবর ছিল — বুফে কারের ম্যানেজার, তার নাম রশীদউদ্দিন ভুইয়া — সে রেলওয়ে পুলিশের কাছে এজাহার দিয়েছে — ছোট সাহেবের বিরুদ্ধে।’

‘শোনো সুলেমান, তুমি সব কথা একবারে বলছ না কেন? ভেঙে ভেঙে কেন বলছ? রশীদউদ্দিন ভুইয়া শুভ্রের বিরুদ্ধে এজাহার কেন দেবে? শুভ্র কী করেছে?’

‘উনি কিছু করেননি।’

‘কিছু করেনি, শুধু শুধু এজাহার।’

‘স্যার, ছোট সাহেব উনার গায়ে থুথু দিয়েছেন।’

‘কী বললে? শুভ্র তার গায়ে থুথু দিয়েছে? শুভ্র?’

‘জি স্যার।’

‘সত্যি দিয়েছে?’

‘জি স্যার, সত্যি?’

‘কেন থুথু দিল?’

‘চা চেয়েছিলেন। চা দিতে দেরি করেছিলেন, এই জন্যে থুথু।’

‘চা দিতে দেরি করেছে, শুধু এই কারণে গায়ে থুথু দিয়েছে?’

‘জি। তবে স্যার রশীদউদ্দিন অত্যন্ত বদ টাইপের লোক। সে লিখিত অভিযোগ করেছে শারপিটের।’

‘আচ্ছা, ঠিক আছে।’

ইয়াজুদ্দিন সাহেব টেলিফোন রাখলেন। রাহেলার ঘূম ভেঙে গেছে। তিনি ভীত গলায় বললেন, কৃত টেলিফোন? শুভ্রের?

‘না। সুলেমান টেলিফোন করেছিল। শুভ্রের খবরাখবর দিল।’

‘শুভ্র ভাল আছে?’

‘হ্যাঁ, ভাল আছে।’

‘ওর চশমা? হ্যান্ডব্যাগের সাইড পকেটে যে চশমা, সেটা বলেছ?’

‘না, বলিনি।’

‘বলনি কেন?’

‘সুলেমান বলল, ও দেখেছে শুভ্রের চোখে চশমা আছে, কাজেই চশমার কথা মনে করিয়ে দেবার প্রয়োজন মনে করিনি। রাহেলা, তুমি আমাকে খুব কড়া করে এক কাপ কফি করে দাও তো !’

রাহেলা চিন্তিত গলায় বললেন, খালিপেটে হঠাৎ কফি চাচ্ছ কেন? কখনও তো খাও না !

ইয়াজউদ্দিন বিরক্ত স্বরে বললেন, কখনো খাই না বলে কোনোদিনও খাওয়া যাবে না তা তো না। এখন খেতে ইচ্ছা করছে। দুধ-চিনি কিছুই দেবে না। ‘র’ কফি।

রাহেলা কফি বানাতে গেলেন। ইয়াজউদ্দিন টেলিফোন করলেন রফিককে। রফিক তাঁর ঢাকা অফিসের জেনারেল ম্যানেজার। নির্ভর করার মতো একজন মানুষ। কোনো জটিল সমস্যাই রফিকের কাছে সমস্যা না।

‘হ্যালো রফিক !’

‘স্নামালিকুম স্যার !’

‘দুঃখিত যে, এত সকালে তোমার ঘূম ভাঙলাম !’

‘কোনো সমস্যা নেই তো স্যার? কী ব্যাপার?’

‘তোমাকে একটু চিটাগাঁও যেতে হবে।’

‘স্যার, আমি ফাস্ট ফ্লাইটেই চলে যাব।’

‘শুভ বোধহয় কী-একটা সমস্যায় পড়েছে। তুমি দূর থেকে সমস্যাটা লক্ষ করবে। সমস্যাটা কি বলব?’

‘আপনার বলার দরকার নেই স্যার, আমি জেনে নেব।’

‘রাখি রফিক !’

‘জি আচ্ছা। আপনি কোনো চিন্তা করবেন না। আমি দেখছি।’

‘থ্যাংক যুু !’

রাহেলা কফি নিয়ে এসে দেখেন — ইয়াজউদ্দিন সাহেব ঘুমিয়ে পড়েছেন। বেশ আরাম করে ঘুমুচ্ছেন।



গল্প-উপন্যাসের অ্যাডভেঞ্চার এবং বাস্তব জীবনের অ্যাডভেঞ্চার একরকমের হয় না। গল্প-উপন্যাসের পুলিশরা সবসময়ই বোকা ধরনের থাকে। অল্প ধমক-ধামকে তারা ভড়কে যায়। হাস্যকর সব কাণ্ড করে। বাস্তবের পুলিশরা মোটেই সেরকমের নয়। ধমক-ধামকে তারা অভ্যন্ত। এ নিয়ে গোটেই মাথা ঘামায় না।

পুলিশের আহঙ্গি আনুশকার ছোটমামা শনেও তারা তেমন ঘাবড়াল না। বিশ্বাস করল না, আবার অবিশ্বাসও করল না। রানা লক্ষ করল, এরা প্ল্যাটফর্মে আছে। শুধু একজন নেই। সে খুব সন্তুষ্ট টেলিফোন করতে গেছে। সে ফিরে এলে কী হবে কে জানে? সবাইকে থানায় যেতে হলে কেলেক্ষারি। রানা একবার বাথরুম করে এসেছে। আবার বাথরুম পেয়ে গেছে। শরীরের সব জলীয় পদার্থ বের হয়ে যাচ্ছে।

এরকম একটা টেনশানের ব্যাপার, কিন্তু দলের মধ্যে কেনেো উদ্বেগ নেই। অবশ্যি আনুশকা ছাড়া আর কেউ কিছু জানে না। কাউকে বলা হয়নি। আনুশকার স্তোত্র খানিকটা ভয়-ভীতি থাকা উচিত। এবং আনুশকার উচিত সবাইকে জানানো। সে তা করছে না। বেশ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে প্ল্যাটফর্মে মালপত্র নামাচ্ছে।

যাকে নিয়ে এত কাণ্ড সেই জরী খুব হাসিখুশি। সে রানাকে এসে বলল, আমাকে একটা টুথব্রাশ এনে দিতে পারবে?

রানা চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, টুথব্রাশ দিয়ে কী করবে?

জরী বলল, খেলব।

'খেলব মানে কি?'

জরী বলল, টুথব্রাশ দিয়ে মানুষ কী করে তুঃস্থি জান রানা। শুধু শুধু জিজ্ঞেস করলে কেন টুথব্রাশ দিয়ে কী করব? আমি কিছুই আনিনি, কাজেই আমার টুথব্রাশ লাগবে, পেস্ট লাগবে, আয়না লাগবে, চিকনি লাগবে।

রাগে রানার গা ঝুলে যাচ্ছে। এত বড় বিপদ সামনে, অথচ মেয়েটা কিছুই বুঝতে পারছে না। বোকার চেষ্টাও করছে না। চেষ্টা করলে রানার শুকনো মুখ থেকে এতক্ষণে ঘটনা আঁচ করে ফেলত। মেয়েরা যে আয়নায় নিজের মুখ ছাড়া অন্য কোনো মুখের দিকেই ভালমত তাকায় না এটাই বোধহয় ঠিক। হোয়াট এ সেলফিস ক্রিয়েচার! হ্যারত আদম যে এত বড় শাস্তি পেলেন, এদের জন্যেই পেয়েছেন।

জরী বলল, কী হয়েছে? এমন পাথরের মতো সুখ করে দাঢ়িয়ে আছ কেন?
টুথ্রাশ একটা কিনে নিয়ে এসো। দাঁত মেজে চা খাব। চা আনতে কেউ কি গেছে?

‘চা—ফার কথা ভুলে যাও। ফরগেট এবাট টী। সামনে গজব।’

‘গজব মানে?’

‘আনুশকাকে জিজ্ঞেস কর “সামনে গজব”—এর মানে কী। সে তোমাকে সুন্দর
করে বুঝিয়ে দেবে। তখন আর দাঁত মাজতে ইচ্ছা হবে না। ইচ্ছা করবে সাঁড়শি
দিয়ে দাঁত টেনে তুলে ফেলতে।’

জরী আনুশকার কাছে গিয়ে বলল, কোনো সমস্যা হয়েছে?

আনুশকা বিরক্ত গলায় বলল, সমস্যা হবে কেন? কে বলেছে সমস্যার কথা?

‘রানা বলছে। ওকে একটা টুথ্রাশ আনতে বলেছিলাম, ও ভয়ংকর গলায় বলল
— সামনে নাকি গজব’।

আনুশকা বলল, তুই ওর কথায় কান দিবি না। টুথ্রাশের কথা ভুলে যা।
আঙুলের ডগায় পেষ্ট নিয়ে দাঁত মেজে ফেল। মোতালেব কোথায়, মোতালেব? ওর
না মাইক্রোবাস ঠিক করার কথা?

রানা কাছেই দাঢ়িয়ে আছে। আনুশকার কথায় রাগে আবার তার গা ভুলে
গেল। মাইক্রোবাস ঠিক করার দায়িত্ব মোতালেবের না, তার। সে ঠিক করেও
রেখেছে। এক ফাঁকে দেখে এসেছে, বাস স্টেশনে চলে এসেছে। পুলিশের নাকের
উপর দিয়ে মাইক্রোবাসে চড়ে বসা বুক্সিমানের কাজ হবে কি না তা বুঝতে পারছে না
বলেই সে চুপচাপ আছে। নয়তো এতক্ষণে জিনিসপত্র বাসে তুলে ফেলত। বানার
বাথরুমে যাওয়াটা খুবই জরুরি হয়ে পড়েছে। এদেরকে পুলিশের হাতে ফেলে
যেতেও ইচ্ছা করছে না। কী থেকে কী হয়ে যাবে কে জানে? বাবে ছুলে আঠারো
ঘা, পুলিশ ছুয়ে দিলে আঠারো দুগুণে ছত্রিশ ঘা। প্লাস দু ঘা একটা। সব মিলিয়ে
আটত্রিশ ঘা।

প্ল্যাটফর্মের এক জায়গায় গোল হয়ে দাঢ়িয়ে থাকা পুলিশের দলটি থেকে
একজন এদিকেই আসছে। রানার পানির তৃষ্ণা পেয়ে গেছে। বুক থা-থা করছে।

পুলিশ অফিসার আনুশকার কাছে এসে দাঁড়ালেন। আনুশকা তার চামড়ার
ব্যাগের ফিতা লাগাচ্ছিল। সে পুলিশ অফিসারের দিকে না তাকিয়েই বলল, কিছু
বলবেন?

‘আপনারা যাচ্ছেন কোথায়?’

‘রাঙ্গামাটি।’

‘ওখানে কি হল্ট করবেন?’

‘জায়গা পছন্দ হলে করব। পছন্দ না হলে করব না।’

‘থাকবেন কোথায়?’

‘হোটেল নিশ্চয়ই আছে। আছে না?’

‘পর্যটনের মোটেল আছে।’

‘তা হলে পর্যটনের মোটেলেই থাকব।’

‘কুম কি বুক করা আছে?’

‘এত কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন?’

‘এত কথা জিজ্ঞেস করেছি, কারণ আপনাদের দলেরই একজন খানিকক্ষণ আগে বললেন — আপনারা সেন্ট মার্টিন আইল্যান্ডে যাচ্ছেন। যিনি বলেছেন তাঁর নাম মোতালেব।’

জরী হাই তুলতে তুলতে বলল, ও কিছু জানে না। শুরুতে আমাদের সেন্ট মার্টিন যাবার প্ল্যান ছিল, পরে বদলানো হয়েছে। মোতালেব শেষ খবর পায়নি। আমরা যখন ফাইন্যাল ডিসিশন নিই তখন সে নাক ডাকিয়ে ঘুমুচিল।

পুলিশ অফিসার আগের মতোই সহজ গলায় বললেন, আপনাদের নেবার জন্য স্টেশনে একটা মাইক্রোবাস দাঢ়িয়ে আছে। বাসটা রাঙ্গামাটি যাবে না। বাস যাবে টেকনাফ।

‘এত খবর নিয়ে ফেলেছেন?’

‘পুলিশে চাকরি করি। আমাদের কাজই হল খবর নেয়া।’

‘আর কী খবর নিলেন?’

‘আরেকটা খবর হচ্ছে — নইমা বলে আপনার যে বাস্কুলারি পাওয়া যাচ্ছে না বলছিলেন তিনি চা খাচ্ছেন। স্টেশনের বাহরে টী-স্টল আছে। সেখানে চা খাচ্ছেন।’

‘তাকে কি বলেছেন যে, আমরা তার খোঁজ করছি?’

‘ছি, বলা হয়েছে।’

‘থ্যাংক যু। থ্যাংক যু ভেরি মাচ।’

‘আমরা আরেকটা খবর নিয়েছি। ঢাকায় ওয়্যারলেস করে জেনেছি, আইজি নুরুন্দিন সাহেবের আনুশক্তি নামে কোনো ভাগ্নি নেই।’

আনুশক্তি মোটেই চমকাল না। সে এত স্বাভাবিকভাবে তার ব্যাগ ঠিক করছে যে রানা মুগ্ধ হয়ে গেল। একেই বোধহ্য বলে ইস্পাতের নার্ভ। এই নার্ভ কতক্ষণ ঠিক থাকে তা দেখার ব্যাপার। বেশি টেনশানে ইস্পাতের নার্ভেরও ছিড়ে যাবার কথা। আনুশক্তির নার্ভ কখন ছিড়বে? রানা সেই দৃশ্য দেখার জন্যে অপেক্ষা করতে পারছে না। তার বাথরুমে না গেলেই নয়। সে বাথরুমের সঙ্কানে ঝওনা হল।

পুলিশ অফিসার বললেন, আপনারা কি আমাদের সঙ্গে থানায় যাবেন?’

আনুশক্তি বলল, হ্যাঁ, যাব।

‘তা হলে চলুন।’

‘এখন তো যেতে পারব না। হাত-মুখ ধোব, চা খাব, তারপর যাব। আপনারা এতক্ষণ অপেক্ষা করবেন?’

‘অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছি। আর অপেক্ষা করা ঠিক হবে না।’

শুন্দি এতক্ষণ চূপ করে শুনছিল। সে অবাক হয়ে বলল, কথাবার্তা কী হচ্ছে আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

পুলিশ অফিসার বললেন, থানায় চলুন। থানায় যাওয়ামাত্রই সব জলের মতো পরিষ্কার বুঝে যাবেন। পুলিশের অনেক কথাই বাহিরে অথহীন মনে হয়। থানা হাজতে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি শব্দের অর্থ পরিষ্কার হয়ে যায়।

‘থানায় যেতে হবে কেন?’

‘সেটাও থানায় গেলেই জানতে পারবেন।’

এতক্ষণে গাড়ি থেকে সবাই নেমে এসেছে। পুলিশের কথাবার্তা যথেষ্ট উদ্বেগের সঙ্গে শুনে যাচ্ছে। জরীর চোখে-মুখে হতভম্ব ভাব। রানা তা হলে ভুল বলেনি। সমস্যা কিছু-একটা হয়েছে। জরীর বলল, ব্যাপার কী রে আনুশকা? উনি আমাদের থানায় যেতে বলছেন কেন?

আনুশকা সহজ গলায় বলল, ওনার ধারণা, আমরা মনিরুজ্জামান নামের এক স্তুলোকের স্ত্রীকে ভাগিয়ে নিয়ে এসেছি। এই জন্যেই আমাদের থানায় যেতে বলছেন।

জরীর আগের চেয়েও অবাক গলায় বলল, মনিরুজ্জামানের স্ত্রীটি কে?

‘মনে হচ্ছে তুই। যে বদমাশটার সঙ্গে তোর বিয়ে হবার কথা ছিল ওর নামই তো মনিরুজ্জামান, তাই না?’

জরীর মুখে কোনো কথা ফুটল না। সে বড়ই অবাক হয়েছে। আনুশকা বলল, তোরা সবাই হাত-মুখ ধুয়ে তৈরি হয়ে নে। আমরা থানায় যাচ্ছি। চা ওখানেই খাব।

নীরা ভীত গলায় বলল, এসব কী হচ্ছে? শুধু শুধু থানায় যাব কেন?

পুলিশ অফিসার অমায়িক ভঙ্গিতে হাসলেন।

আনুশকা বলল, আমরা আমাদের মালপত্র কী করব? এখানে রেখে যাব, না সঙ্গে নিয়ে যাব?

‘সেটা আপনাদের ব্যাপার। আপনারা ঠিক করবেন। দেরি করবেন না, চলুন।’

আনুশকা উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, রানা কোথায় গেল? ও হচ্ছে আমাদের টীম লীডার। মালপত্রের ব্যাপারে ওর ডিসিশন লাগবে।

রানা টয়লেট খুঁজে বেড়াচ্ছে। বিপদের সময় কিছুই পাওয়া যায় না। এ পর্যন্ত দু'জনকে জিঞ্জেস করল, টয়লেট কোথায়? দু'জনই এমনভাবে তাকাল যেন এই

শব্দটা জীবনে প্রথম শুনছে। টয়লেট শব্দের মানে কী জানে না। স্টেশনের কাউকে ধৰা দরকার। এরাও সব উধাও। নহিমাকে দেখা যাচ্ছে। বেশ হাসি-হাসি মুখে আসছে। হাতে পত্রিকা। নহিমা বলল, এই রানা, যাচ্ছ কোথায়?

‘টয়লেট খুঁজছি। টয়লেটটা কোথায় জান?’

‘আমি কী করে জানব?’

‘না জানলে বলো, জানি না। রেগে যাচ্ছ কেন?’

‘মেয়েদের টয়লেট সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করাই অভদ্রতা। এই জন্যে রেগে যাচ্ছ। তোমার কি ইমারজেন্সি?’

‘হ্যা, ইমারজেন্সি।’

‘বড় টয়লেট, না ছোট টয়লেট?’

‘কী যন্ত্রণা! ছোট।’

‘তা হলে কোনো-একটা ট্রেনের কামরায় ঢুকে পড়লেই হয়। ছুটে বেড়াচ্ছ কেন?’

বিপদের সময় সব এলোমেলো হয়ে যায়, এটা খুবই সত্যি। সাধারণ ব্যাপারটা তার মাথায় আসেনি কেন? রানা লাফ দিয়ে সামনের একটা ট্রেনের কামরার উঠে গেল।

নহিমা অপেক্ষা করছে। রানা নামলে তাকে একটা মজার জিনিস দেখাবে। রানা রাজি থাকলে তাকে নিয়ে আরেক কাপ চা খাবে। ওরা নিশ্চয়ই তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। কিছুক্ষণ টেনশানে ভুগ্রক। হ্র কেয়ারস?

রানা নামতেই নহিমা বলল, চাটগাঁও লোকরা ‘ঘূমুচ্ছি’-কে কী বলে জান? তারা বলে, ‘ঘূম পাড়ি’। ঘূম কি ডিম নাকি যে ডিম পাড়ার মত ঘূম পাড়বে? হি-হি-হি।

রানা ধমকের সূরে বলল, হাসি বন্ধ করো।

‘হাসি বন্ধ করব মানে?’

‘কেলেখকেরিয়াস ব্যাপার হয়ে গেছে। পুলিশ আমাদের অ্যারেস্ট করেছে।’

‘তুমি এত ফালতু কথা বল কেন?’

‘মোটেও ফালতু কথা বলছি না। অবস্থা সিরিয়াস। উই আর আন্ডার অ্যারেস্ট।’

‘আমরা কী করেছি? ডাকাতি করেছি?’

‘তোমরা ডাকাতির চেয়েও বড় জিনিস করেছে। অন্যের বউ ভাগিয়ে নিয়ে চলে এসেছে।’

‘রানা, তোমার ব্রেইনের নাট-বল্টু সব খুলে পড়ে গেছে। তুমি ঢাকায় গিয়েই ধোলাইখালে চলে যাবে। নাট-বল্টু লাগিয়ে নেবে। তোমার যা সাহজ, রেডিমেড পাওয়া যাবে না। লেদ মেশিনে বানাতে হবে।’

রানা আওন-চোখে তাকাল। সে ভেবে পাছে না পুরুষ এবং মেয়ের মন্তিক্ষের ঘিলুর পরিমাণ সমান হওয়া সত্ত্বেও মেয়েরা পৃথিবীর কিছুই বোঝে না কেন?

যে বাস ওদের টেকনাফ নিয়ে যাবে বলে এসেছে সেই বাসে করেই ওরা থানায় যাচ্ছে। পুলিশের দু'জন লোক বাসে আছে। একজন বসেছে ড্রাইভারের পাশে, অন্যজন আনুশকাদের সঙ্গে। নহিমা সেই পুলিশ অফিসারের দিকে তাকিয়ে করুণ গলায় বলল, আচ্ছা, চিটাগাং-এর লোকরা ‘ঘূমাচ্ছি’ না বলে ‘ঘূম পাড়ি’ বলে কেন? ঘূম কি ডিম যা পাড়তে হয়? সবাই হো-হো করে হাসছে। পুলিশ অফিসারটি হাসছে না।

সে তাকিয়ে আছে শুধের দিকে। শুভ বলল, আপনি কি আমাকে কিছু বলবেন?

‘হ্যাঁ, বলব। আপনার নাম শুভ?’

‘জ্ঞি।’

‘আপনার বিরক্তে আলাদা স্পেসিফিক অভিযোগ আছে। গুণামির অভিযোগ। আপনি রশীদউদ্দিন ভূইয়া নামে বুফে কারের কেয়ারটেকারকে মারাধোর করেছেন। চাকু দিয়ে ভয় দেখিয়েছেন এবং এক পর্যায়ে তাকে চলন্ত টেন থেকে ঠেলে নিচে ফেলে দেবার চেষ্টা করেছেন।’

শুভ শুধু একবার বলল — আমি?

বলেই সে চুপ করে গেল। অন্য সবাই চুপ। শুধু নহিমা এখনো হেসে যাচ্ছে। চিটাগাং-এর লোকেরা ঘূমিয়ে পড়াকে কেন ‘ঘূম পাড়ি’ বলে — এটা কিছুতেই তার মাথায় তুকছে না।

অয়ন বাসের বড় ধরে দাঁড়িয়ে আছে। মুনার পাশে খালি জায়গা আছে। সে যেখানে দাঁড়িয়ে সেখান থেকে মুনার পাশের জায়গাটাই সবচে কাছে। কাজেই অয়ন যদি সেখানে গিয়ে বসে কেউ অন্য কিছু ঘনে করবে না। সে ঠিক ভরসাও পাচ্ছে না। মুনা যদি ফট করে কিছু বলে বসে।

রানা বলল, তুই হাঁদার মত দাঁড়িয়ে আছিস কেন? বসো না।

অয়ন মুনার পাশে বসতে গেল। মুনা বলল — আপনার গা থেকে বিশ্রী গন্ধ আসছে। অন্য কোথাও গিয়ে বসুন।

অয়ন আগের জায়গায় ফিরে গেল।



ওসি সাহেব তাদের থানার লকআপে ঢুকিয়ে দিলেন। ছেলেরা এবৎ মেয়েরা আলাদা হয়ে গেল। এই ওসি সাহেবকে স্টেশনে দেখা যায়নি। তিনি স্টেশনে যাননি। ভদ্রলোকের বয়স বেশি না। ভদ্র চেহারা। পুলিশের ভদ্র চেহারা হলে অস্বস্তি লাগে। মনে হয় কিছু-একটা ঝামেলা আছে। তা ছাড়া ভদ্রলোক পাঞ্জাবি পরে আছেন। পুলিশের লোক থানার ভেতরে পাঞ্জাবী পরবেন কেন?

জেনানা ওয়ার্ড এক অল্পবয়স্ক পাগলীকে রাখা হয়েছে। সে বমি করে পুরোটা ভাসিয়ে ফেলেছে। সে শুধু বমি করেই ক্ষান্ত হয়নি — মনের আনন্দে নিজের বমিতে গড়গড়ি করছে। ভয়ংকর গৰ্ব। কোনো স্বাভাবিক মানুষ এর মধ্যে থাকতে পারে না। প্রথমে নইমার নিঃশ্঵াস বন্ধ হয়ে এল। ফিসফিস করে বলল, এখনে এক ঘণ্টা থাকলে আমি মরে যাব। আমি সত্যি মরে যাব। কেন আমি তোদের সঙ্গে এলাম! কেন এলাম? কেন এলাম? নইমার হিস্টরিয়ার মতো হয়ে গেল।

আনুশকা বলল, ন্যাকামি করবি না। এখন ন্যাকামির সময় না।

‘আমি ন্যাকামি করছি? আমি করছি ন্যাকামি? আমি ন্যাকামি করছি?’

‘চুপ কর। এক কথা বাবুবাব বলবি না।’

নইমা ওয়াক ওয়াক করতে লাগল। সে যেভাবে ওয়াক ওয়াক করছে — মনে হয় কিছুক্ষণের মধ্যে তার পাক্ষলীর পুরোটা বেঁ হয়ে আসবে।

আনুশকা কঠিন গলায় বললো, তুই যদি ওয়াক ওয়াক বন্ধ না করিস তা হলে আই স্যোয়ার বাহি দ্য নেম অব গড — এই বমির খানিকটা তোকে খাইয়ে দেব।

নইমা ওয়াক ওয়াক বন্ধ করল। তবে সে বসে পড়ল। মনে হচ্ছে সে সত্যি সত্যি আজ্ঞান হয়ে যাবে। সে ক্ষীণ স্বরে বলল, আনুশকা, আমি মরে যাচ্ছি। আমি সত্যি মরে যাচ্ছি। নিঃশ্বাস নিতে পারছি না। তলাবন্ধ ঘরে আমি থাকতে পারি না। আমার ক্লিপ্সটাফোবিয়া আছে।

মুনা নইমাকে ধরে রেখেছে। তার হাতে একটা ম্যাগাজিন। সে ম্যাগাজিনটা পাখার মতো করে ক্রমাগত নইমার মাথায় বাতাস করে যাচ্ছে।

নীরা মুখে শাড়ির আঁচল চাপা দিয়ে উপরের দিকে তাকিয়ে আছে। সেও কাঁপছে থরথর করে। জরী একদ্বিতীয়ে পাগলী মেয়েটাকে দেখছে। মেয়েটা কৃৎসিত

নোংরায় মাথামাখি হয়ে আছে। মাথার চুল ছেলেদের মতো ছোট ছোট করে কাটা। তার পরেও এই মেয়েটি যে কৃপবতী তা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে।

নইমা গোঙানির মতো শব্দ করতে লাগল। মুনা ভয় পেয়ে আনুশকাকে বলল, আপা, উনি কেমন জানি করছেন। আনুশকা গলা উচিয়ে ডাকতে লাগল — কে আছেন এখানে? কে আছেন? ওসি সাহেব! ওসি সাহেব!

ওসি সাহেব এগিয়ে এলেন। তাঁর মুখে জ্বলন্ত সিগারেট। মুখের ভঙ্গি অত্যন্ত শাস্ত। যেন কিছুই হয়নি।

‘হৈচে করছেন কেন?’

‘সঙ্গত কারণেই হৈচে করছি। কেন করছি সেটা আপনার না বুঝতে পারার কোনো কারণ নেই। আপনাকে দেখেই মনে হচ্ছে আপনি বুদ্ধিমান। তবে বুদ্ধিমান লোকরা মাঝে মাঝে খুব কাঁচা কাজ করে। আপনি আমাদের হজাতে ঢুকিয়ে যে কাঁচা কাজটি করেছেন তার ফলাফল সুদূরপ্রসারী হবার সম্ভাবনা।’

ওসি সাহেব আগের চেয়েও শাস্ত গলায় বললেন, মিস আনুশকা, কাঁচা কাজ আমাদের প্রায়ই করতে হয়। কাঁচা কাজ করতে যে আমরা ভালবাসি কিংবা ইচ্ছা করে করি তা না। উপরের নির্দেশ পেয়েই করি।

‘উপরের নির্দেশ পেয়েছেন বলে আমাদের একটা পাগলীর সঙ্গে খাচার ভেতর আটকে রাখতে হচ্ছে?’

‘অবশ্যই। আপনাদের দেখেই বোঝা যাচ্ছে — আপনাদের ক্ষমতা আছে। আপনাদের যোগাযোগ ভাল। খোদ প্রাইম মিনিস্টারের সঙ্গেও আপনাদের কারোর আত্মীয়তা থাকা মোটেই বিচিত্র না। আমি শখ করে আপনাদের এখানে ঢোকাব কেন?’

‘আপনি আমাদের আটকে রাখবেন?’

‘ছি। আমার উপর সেরকমই নির্দেশ। আপনাদের বিরুদ্ধে কিডন্যাপিং-এর মামলা আছে। একজনের বিবাহিতা স্ত্রীকে আপনারা কিডন্যাপ করে নিয়ে এসেছেন। তার গায়ে ঢার লক্ষ ঢাকার গয়না আছে। কোট থেকে আপনাদের গ্রেফতার করতে বলা হয়েছে। আমরা করেছি। কিছু জিঞ্জুসাবাদ করে আপনাদের কোটে হাজির করব। তখন কোট যদি আপনাদের জামিন দেয় — আপনারা যেখানে যাচ্ছিলেন সেখানে চলে যাবেন। আমরা কাজ করছি According to the Books.’

‘আমি কয়েকটা টেলিফোন করব।’

‘আমাদের টেলিফোন নষ্ট।’

‘অর্থাৎ আপনি আমাদের টেলিফোন করতেও দেবেন না?’

‘বললাম তো, আমাদের টেলিফোন নষ্ট। ডায়াল টোন নেই।’

‘কতক্ষণ আমাদের এভাবে আটকে রাখবেন?’

‘মনিরজ্জামান সাহেব ঢাকা থেকে রওনা হয়েছেন। উনি এসে পৌছার পরই
ব্যবস্থা হবে।’

‘উনি কখন এসে পৌছবেন?’

‘সেটা নির্ভর করে উনি কিসে আসেন তার উপর। ফাস্ট ফ্লাইটে এলে বেলা
নটার মধ্যে পৌছে যাবার কথা। যদি হেঁটে আসেন তা হলে দিন দশক লাগার
কথা।’

‘আপনি কি আমাদের সঙ্গে রসিকতা করছেন ওসি সাহেব?’

‘জ্বি, করছি। শুধু আপনারাই রসিকতা করতে পারবেন আর আমরা পুলিশের
চাকরি করি বলে রসিকতা করতে পারব না — তা তো হয় না।’

আনুশক্তি হাল ছেড়ে দিল। ওসি সাহেব চলে যেতে ধরলেন, তখন জরী নরম
গলায় ডাকল, ওসি সাহেব, আপনি কি আমার কিছু কথা শুনবেন?

‘জ্বি শুনব। বাংলাদেশের পুলিশের বর্তমানে প্রধান কাজ হচ্ছে কথা শোনা।
আমরা সবার কথা শুনি। বলুন কী বলবেন?’

‘সমস্যাটা তো আমাকে নিয়ে? আমি তো আছি। আমাকে যেখানে রাখবেন
আমি সেখানেই থাকব এবং মনিরজ্জামান সাহেবের জন্যে অপেক্ষা করব। আপনি
এদের ছেড়ে দিন। আর ছেড়ে দিতে না পারলে অফিসে নিয়ে বসান। পৌঁজ। তাকিয়ে
দেখুন — আমাদের একজন অসুস্থ হয়ে পড়েছে। নিঃশ্বাস নিতে পারছে না।’

‘আপনাদের কষ্ট করতেই হবে। উপায় নেই।’

আনুশক্তি বলল, খুব ভাল কথা। আমাদের ছাড়তে না পারেন — এ
পাগলীটাকে ছাড়ুন। তাকে ধরে রেখেছেন কেন? সেও কি কাউকে কিডন্যাপ করে
নিয়ে এসেছে?

‘না, সে কাউকে কিডন্যাপ করে আনেনি।’

‘তা হলে তাকে হাজতে ভরে রেখেছেন কেন? হাতের কাছে সুন্দরী মেয়েছেলে
না থাকলে ভাল লাগে না?’

‘দেখুন মিস আনুশক্তি, আপনি সকাল থেকেই অত্যন্ত আপত্তিকর কথা বলে
যাচ্ছেন।’

‘যতক্ষণ আমাদের না ছাড়বেন ততক্ষণ বলব। তা ছাড়া আপনারা রূপবতী
বিকৃতমন্ত্রিক একটি মেয়েকে অকারণে ধরে রেখে দেবেন, আমরা কিছু বলতেও
পারব না?’

‘অকারণে ধরে রাখিনি। পাগল গ্রেফতার করার বিধান আছে। তা ছাড়া মেয়েটি

সুন্দরী। পাড়ার মাস্তানদের হাতে ঘন ঘন রেপ্ট হবার কপলা নিয়ে এসেছে। তাকে বাঁচানোর জন্যেই এখানে এনে রেখেছি।'

'যারা রেপ করছে তাদের কিছু বলছেন না, যে রেপ্ট হচ্ছে তাকে হাজতে ভরে রেখেছেন! আপনারা তো অত্যন্ত প্রশংসনীয় কাজ করছেন। শুনুন ওসি, আমি অত্যন্ত ভদ্র এবং বিনীত ভাষায় আপনার কাছে একটি অনুরোধ করছি — তাকিয়ে দেখুন, হাত জোড় করে বলছি। এই পাগলীটাকে ছাড়তে হবে না। একে হাজতেই রাখুন — তবে দয়া করে একে ভাল করে সাবান দিয়ে একটা গোসল দিন। আমি টাকা দিচ্ছি — বাজার থেকে কিনে নতুন শাড়ি-ব্লাউজ-পেটিকোট নিয়ে আসার ব্যবস্থা করুন। ওর গায়ে যেসব কাপড় আছে সেগুলি হয় মাটির নিচে পুঁতে ফেলার ব্যবস্থা করুন, কিংবা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিন। আগুন জ্বালাবার খরচও আমি দেব। তারপর আপনি যা করবেন তা হচ্ছে — বড় দু' বালতি পানি পাঠাবেন, একটা শলার ঝাড়ু পাঠাবেন এবং এক লিটারের একটা ফিলাইলের কোটা পাঠাবেন। আমি নিজেই এই হাজতখানা ধোব। আমি নিজে যে ধোব, তার জন্যেও আপনাকে খরচপাতি দেব। এইখানেই শেষ না — পরবর্তী সময়ে আপনাকে পুরস্কৃত করব।'

'আমাকে পুরস্কৃত করবেন?'

'হ্যাঁ। আপনাকে এমন এক জায়গায় ট্রান্সফারের ব্যবস্থা করব যেখানে খুনের ছড়াছড়ি। প্রতি সপ্তাহে একটা করে মার্ডার হয় — তিনটা রেপ — গোটা দশেক ডাকাতি প্লাস চোরাচালানি। এমন সুবর্ণ সুযোগ হেলায় হারাবেন না ওসি সাহেব। Chance of lite time.'

মুনা খিলখিল করে হাসছে। এমন আনন্দিত ভঙ্গিতে সে অনেকদিন হাসেনি। তাকে হাসতে দেখে পাগলীটাও হাসছে। ওসি সাহেব কিছু বললেন না। যেরকম শান্ত ভঙ্গিতে এসেছিলেন সে রকম শান্ত ভঙ্গিতে চলে গেলেন।

তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এক বালতি পানি এবং বাঁটা নিয়ে জমাদার উপস্থিত হল। দাঁত বের করে বলল, ওসি সাহেব বলছেন, শাড়ি তেল সাবান কী কী জানি কিনবেন — টেকা দেন।

আনুশক্তি তার পার্স খুলে টাকা বের করল। জরীর দিকে তাকিয়ে বলল, জরী শোন, তুই কোনো ভয় পাচ্ছিস না তো? না, আমার কেন জানি মনে হচ্ছে এই ওসি মানুষটা খারাপ না। তোর কোনো বিপদ ওই ওসি হতে দেবে না।

'এরকম মনে হবার কারণ কি?'

'কোনো কারণ নেই —। ইন্ট্রুশন।'



এৰকম যে কিছু ঘটবে রানা জানত। বিপদের ইঙ্গিত মানুষের কাছে আগে আগে পৌছে। আল্লাহপাক মানুষকে ইশারা দেন। রানাকেও দিয়েছেন। রানা সেই ইশারা বুঝতে পারেনি। চিটাগং রওনা হবার সময় সে দেখেছে টেবিলে খালি পানির জগ। এটা হল প্রথম ইশারা। দ্বিতীয় ইশারা হল, সে যে-বেবিট্যাক্সি নিয়ে রওনা হল মাঝপথে সেটার স্টার্ট বজ হয়ে গেল। কার্বোরেটার দিয়ে তেল পাস করছে না। এটা হল দ্বিতীয় ইশারা। সে নিতান্ত বেকুব বলেই পরিষ্কার ইশারাও ধৰতে পারেনি। এতক্ষণে তারা কক্সবাজার পৌছে যেত। তার বদলে থানা-হাজতে বসে আছে।

রানার আবার বাথরুম পেয়েছে। এক রাতের টেনশানে ডায়াবেটিস হয়ে গেল নাকি? টেনশানে নানান ধরনের অসুখবিসুখ হয়, ডায়াবেটিসও হতে পারে। ঢাকায় পৌছেই সুগার টেস্ট কৰাতে হবে। হাজতে ঢোকার পর এর মধ্যে দু'বার বাথরুমে গেছে। তৃতীয়বার যেতে চাওয়া কি ঠিক হবে? শেষে এরা বিরক্ত হয়ে বলবে — ‘পিসাব-পায়খানা’ বা করার এইখানেই করেন। থানাওয়ালাদের এখন বিরক্ত করা যাবে না। কিছুতেই না। এই সাধারণ সত্যটা দলের কেউ বুঝতে পারছে না। তাদের ভাব দেখে মনে হচ্ছে, তারা এখানেও পিকনিক করছে। এদের ধরে ধরে চাবকাতে হবে।

যোতালেব এর মধ্যে পুলিশ-সেন্ট্রিকে হাত ইশারা করে ডেকে বলেছে — ‘মটু ভাইয়া, চায়ের ব্যবস্থা করা যায়?’ এই পুলিশের স্বাস্থ্য একটু ভালু দিকে। ভালু দিকে বলেই তাকে ‘মটু ভাইয়া’ বলতে হবে? পুলিশের হাজতে বসে পুলিশকে ‘মটু ভাইয়া’ বলা! রানা ভেবে পাচ্ছে না এদের সবার একসঙ্গে বেহীন শট সাকিঁচ হয়ে গেছে কি না। এত বড় একটা বিপদ যাচ্ছে, সেই বিপদ নিয়ে চিন্তা নেই। কী করে উদ্ধার পাওয়া যায় তা নিয়ে মাথাব্যথা নেই। মেয়েগুলিকে আলাদা করে ফেলেছে এটাও চিন্তার বিষয়। বিরাট চিন্তার বিষয়। কে চিন্তা করবে? সব চিন্তা কি সে একা করবে? শুভ্র গাধটা একটা বই নিয়ে কোণায় বসে আছে। এটা কি বই পড়ার সময়? বল্টু কম্বলে হাত-পা গুটিয়ে শুয়ে পড়েছে। মনে হচ্ছে ঘুমছে। সঞ্চকে দেখেও মনে হচ্ছে না সে ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝতে পারছে। বায়ে ছুলে আঠারো ঘা, পুলিশ ছুলে বক্রিশ ঘা — এই সত্য যে-কোনো বাচ্চাছেলেও জানে। এরা মনে হয় জানে না।

সঞ্চু বলল, রানা, কটা বাজে ?

রানা জবাব দিল না। ফালতু কথা বলার সে কোনো প্রয়োজন দেখছে না। কটা বাজে এটা জেনে হবে কী ?

'কথা বলছিস না কেন ?'

'চূপ থাক গাধা !'

সঞ্চু বলল, তুই আমার উপর রাগ করছিস কেন ? আমি কি তোদের এনে জেলে টুকিয়েছি ?

'বললাম তো চূপ করে থাক !'

রানার কথাবার্তা বলতে ভাল লাগছে না। উদ্ধার পাওয়ার বুদ্ধি বের করতে হবে। মাথায় কোনো বুদ্ধি আসছে না। সবাব আগে যা করতে হবে তা হল — থানাওয়ালার সঙ্গে একটা অন্ডারম্প্ট্যান্ডিং-এ আসা। যদি হাজতে রাত কাটাতে হয় — তা হলে কম্বল-টম্বল লাগবে। খাওয়াদাওয়া লাগবে। এইসব কাজে পয়সা খরচ করতে হয়।

রানা বলল, বল্টু ঘুমাচ্ছে নাকি ? আশ্চর্য ! সঞ্চু, বল্টুটাকে কানে ধরে তোল তো !

'কেন ? ঘুমাচ্ছে ঘুমাক না। টেনে সারা রাত ঘুম হয়নি !'

'তোল বললাম !'

'তুই এমন টেনশানে আছিস কেন ? কী হয়েছে ?'

'কী হয়েছে বুঝতে পারছিস না ?'

'না !'

'ভাল। তা হলে তুই আর শুধু শুধু জেগে আছিস কেন ? তুইও ঘুমিয়ে পড়। আয়, আমার কোলে মাথা রেখে ঘুমা !'

'শুধু শুধু টেনশান করে তো কোনো লাভ নেই !'

শুভ্র বই থেকে মুখ তুলে বলল, ওরা একটা ভুল করেছে। ভুলটা যখন ধরা পড়বে তখন লজ্জিত হয়ে আমাদের ছেড়ে দেবে।

রানা বলল, গাধার মতো কথা বলবি না শুভ্র। গাধামি কথা বন্ধ করে যা করছিস তাই কর। বই পড়। জ্ঞান বাঢ়া। কী বই এটা ?

'ব্রিফ হিস্টরি অব টাইম। সময় ব্যাপারটা আসলে কী তা বলার চেষ্টা করা হয়েছে !'

মোতালেব কৌতৃহলী হয়ে বলল, সময় ব্যাপারটা কী ?

শুভ্র বেশ আগ্রহের সঙ্গে সময় কী তা বলতে শুরু করল। সঞ্চু এবং মোতালেব দুজনই শুনছে। বেশ মন দিয়েই শুনছে।

ରାନା ଭେବେ ପାଛେ ନା କେନ ସେ ଏକଦଳ ଗାଧାକେ ନିଯେ ରଖନା ହଲ ? ଏହି ସୁନ୍ଦି କେ ତାକେ ଦିଲ ? ସେ ଠିକ କରେଛେ, ଏହି ଝାମେଲା ଥେକେ ଏକବାର ବେର ହତେ ପାରଲେ କାନେ ହାତ ଧରେ ଦଶବାର ଉଠ-ବୋସ କରବେ । କୋରାନ ଶୀର୍ଷ ହାତେ ନିଯେ ପଞ୍ଚିମ ଦିକେ ମୁଖ କରେ ବଲବେ, ଆବ କୋନୋଦିନ ଏହି-ଜାତୀୟ ଦାୟିତ୍ବ ନେବେ ନା ।

ମେନ୍ଟ୍ରି-ପୁଲିଶ ପାଶ ଦିଯେ ଯାଛିଲ । ରାନା ବଲଲ, ଭାଇ ସାହେବ, କାହଟ୍ଟଡଲି ଏକଟୁ ଶୁନବେନ ? ଓସି ସାହେବେର ସଙ୍ଗେ ଏକଟୁ ପ୍ରାହିଭେଟ କଥା ବଲତେ ଚାହି — ଏକଟୁ କି ବଲବେନ ଓସି ସାହେବକେ ?

‘ଓସି ସାହେବ ଚେଯାରେ ନାହିଁ ।’

‘ଚେଯାରେ ଯଥନ ଆସବେନ ତଥନ କି ବଲବେନ ?’

‘ଆଜ୍ଞା ଦେଖି ।’

‘ଦେଖାଦେଖି ନଯ ଭାଇ, ଏହି କାଜଟା କରତେଇ ହବେ । ଛେଟ ଭାଇ ହିସେବେ ଏଟା ଆପନାର କାଛେ ଆମାର ଏକଟା ରିକୋଯେସ୍ଟ, ଆବଦାର । ଆବ ଶୁନୁନ ଭାଇ, ଏକଟୁ କାଛେ ଆସୁନ ।’

ମେନ୍ଟ୍ରି-ପୁଲିଶ କାଛେ ଏଲ ।

ରାନା ଦଲା ପାକିଯେ ଏକଟା ଏକଶ’ ଟାକାର ମୋଟ ଏଗିଯେ ଦିଯେ ଫିସଫିନ କରେ ବଲଲ, ରେଖେ ଦିନ, ପାନ ଖାବେନ ।

ପାନ ଖାବାର ବ୍ୟାପାରେ ପୁଲିଶେର କୋନୋ ଆପଣି ଦେଖା ଗେଲ ନା । ରାନା ଚୋଖ ବନ୍ଧ କରେ ଭାବଛେ । ପରିଷ୍କାର କିନ୍ତୁ ଭାବତେ ପାରଛେ ନା । ମାଥା ଜ୍ୟାମ ହେଁ ଆଜେ । ଶୁଦ୍ଧ ଜ୍ୟାମ ନା — ଯନ୍ତ୍ରଣାଓ କରଛେ । ଶୁଦ୍ଧ ବକରକ କରେଇ ଯାଚେ —

‘ବସ୍ତୁର ଗତି ଯଥନ ଆଲୋର ଗତିର ସମାନ ହେଁ ଯାଯ, ତଥନ ଆଇନ୍‌ସ୍ଟାଇନ୍‌ର ରିଲୋଟିଭିଷ୍ଟିକ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ବନ୍ତର ଭର ହେଁ ଅସୀମ । ସୂତ୍ରଟା ହଚେ — ଏମ ଇକ୍କୁଯେଲେସ ଟୁ ଏମ ନଟ, ସଂକ୍ଷୟାର ରୁଟ ଅବ . . .’

ରାନା ଦୀଘନିଃଶ୍ଵାସ ଫେଲଲ । ଏରା ସୁଖେଇ ଆଜେ । କୋନୋ ଚିନ୍ତା-ଭାବନା ନେଇ । ମେ ଘଡ଼ି ଦେଖିଲୋ — ଏଗାରୋଟା ବାଜେ । ପ୍ରାୟ ସାଡେ ତିନ ଘଣ୍ଟା କେଟେ ଗେଲ ହାଜତେ . . . । ଦେଖିତେ ଦେଖିତେ ଦୁପୂର ହେଁ, ତାରପର ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଁ, ରାତ ହେଁ, ମକାଳ ହେଁ, ଆବାର ଦୁପୂର ହେଁ, ଆବାର ମନ୍ଦ୍ୟା . . .

ରାନାର ଗା କାଁଟା ଦିଯେ ଉଠିଲ । ବାଥରମ୍ବେ ବେଗ ପ୍ରବଳ ହେଁବେ । ଆବ ଚେପେ ରାଖା ଯାଚେ ନା । ଏଥନ ଏକବାର ଯେତେଇ ହେଁ । ମେ ମେନ୍ଟ୍ରିକେ ହାମିମୁଖେ ଡାକଲ, ଏହି ଯେ ପୁଲିଶ ସାହେବ, ପୁଲିଶ ସାହେବ !

‘କି ହଇଛେ ?’

‘ଏକଟୁ ଭାଇ ବାଥରମ୍ବେ ଯାଓଯା ଦରକାର ।’

‘ଟାଟି କରବେନ ?’

‘জ্ঞি না। ছোটা করব।’

‘একটু আগেই তো করছেন। মিনিটে মিনিটে পিসাব করলে তো হবে না।’

রানা হতভম্ব হয়ে দেখল — সেন্ট্রি-পুলিশ চলে যাচ্ছে। অথচ তাকে একটু আগে পান খাওয়ার জন্যে একশ’ টাকা দেয়া হয়েছে। রানা শুকলো মুখে সিগারেট ধরাল। বল্টু উঠে বসেছে। মনে হচ্ছে, সে চোখ বন্ধ করে মটকা মেরে পড়ে ছিল। বল্টু রানার দিকে তাকিয়ে গভীর গলায় বলল, রানা শোন, — বেগ খুব বেশি হলে এখানেই ছেড়ে দে। খামাখা রিকোয়েস্ট-ফিকোয়েস্ট করে লাভ কী? যে দেশের যে নিয়ম। ওদের টাইম টেবিল অনুযায়ী তো আর আমাদের পিসাব ধরবে না। কী আর করা।

রানা শুনেও না শোনার ভাব করল। শুন্দি সমানে বক্তৃতা দিয়ে যাচ্ছে — আমাদের প্রচলিত ধারণা হল, সময় প্রবহমান। নদী যেমন প্রবাহিত হচ্ছে — সময়ও প্রবাহিত হচ্ছে। সময়ের প্রবাহ শুরু হয়েছিল সৃষ্টির আদিতে at the time of Big Bang. সেই প্রবাহ চলছে। নদীর প্রবাহ শেষ হয় সমুদ্রে — সময়ের প্রবাহের শেষ কোথায়? এখন ব্যাপারটা বোঝার জন্যে একটা কাজ করা যাক — একটা থট এক্সপ্রেসিভেট করা যাক . . .

রানার ইচ্ছা হচ্ছে, থাবড়া মেরে শুধের বক্তৃতা বন্ধ করে দিতে। এই প্যাচাল বেশিক্ষণ শোনা সম্ভব না। সময়ের শুরু কোথায় হয়েছে তা দিয়ে কিছু যায় আসে না। তাদের সময়টা কীভাবে যাচ্ছে এটাই বড় কথা।

ব্রাডারের চাপ যে হারে বাড়ছে তাতে মনে হচ্ছে কিছুক্ষণের মধ্যে দুটা ছোট ছোট এক্সপ্লোশান হবে এবং দুটা ব্রাডারই ফেটে যাবে। মানুষের ব্রাডার কটা থাকে? দুটা, না একটা? এই তথ্যটা শুধের কাছ থেকে জেনে নেয়া দরকার। যে সময় নিয়ে এত প্যাচাল পাড়তে পারে সে নিশ্চয়ই মানুষের ব্রাডারের সংখ্যা জানে।

রানা করুণ গলায় ডাকল — পুলিশ সাহেব! ভাই, একটু কাইন্ডলি শুনে যান তো!

সেন্ট্রি অন্য দিকে তাকিয়ে দাঁত খোঁচাচ্ছে। সে এখন মনে হয় কানেও শুনতে পারছে না। পান খাওয়ার জন্যে একশ’ টাকা না দিয়ে দুশ’ টাকা দেয়ার দরকার ছিল। অ্যামাউট কম হয়েছে।

‘এই যে ভাই, পুরীজ। ছোট একটা কথা শুনে যান।’

সেন্ট্রি গভীর মনযোগে দাঁত খোঁচাচ্ছে। দাঁত খোঁচানো শেষ হলে নিশ্চয়ই কান খোঁচাবে। খোঁচাখুঁচি যাদের স্বভাব তারা স্থির থাকতে পারে না। তাদের সবসময় কিছু-না কিছু খোঁচাতে হয়।

রানা আবার করুণ গলায় ডাকল — পুলিশ সাহেব! ব্রাদার। একটু শুনবেন?



মনিকজ্ঞামান ওসি সাহেবের সামনে বসে আছে। মনিকজ্ঞামানের গায়ে শ্রী পিস সুট, লাল টাই। কোটের বাটন হোলে পাতাসহ গোলাপের কুঁড়ি। গোলাপটা ঠিক আছে — পাতা দুটি মরে গেছে। মনিকজ্ঞামানের মুখে তেলতেলে ভাব হাসি। সে আজ সারা দিনে প্রচুর পান খেয়েছে বলে মনে হয়। দাঁত খয়েরি বর্ণ ধারণ করেছে। ঠোট দুটিও লাল। মনিকজ্ঞামানের হাতে সাদা রুমাল। কিছুক্ষণ পরপর ঠোট মোছার জন্যে রুমাল ব্যবহার করতে হচ্ছে।

মনিকজ্ঞামানের পাশে আছে হারুনুর রশীদ। হারুনুর রশীদের কাজ হচ্ছে মনিকজ্ঞামানকে ছায়ার মতো অনুসরণ করা। হারুনুর রশীদ পাতলা একটা পাঞ্চাবি পরে আছে। নিচে গেঞ্জি নেই বলে পাঞ্চাবির ভেতর দিয়ে তার লোমভর্তি বুক দেখা যাচ্ছে। হারুনুর রশীদের মুখ খুব গঞ্জীর। সেই তুলনায় মনিকজ্ঞামানের মুখ হাসি-হাসি।

মনিকজ্ঞামান বলল, তারপর ওসি সাহেব, ভাই, কেমন আছেন বলেন দেখি।
‘জি, ভাল আছি।’

‘সকালে চলে আসতাম — ফাস্ট ফ্লাইট পেলাম না। গাড়িতে রওনা হলে পৌছতে পৌছতে বিকাল হবে। সেকেন্ড ফ্লাইটে এসেছি।’

‘ভাল করেছেন।’

‘আমি এসেই আপনার বিষয়ে খোজখবর করেছি। খবর যা পেয়েছি তাতে মনটা ভাল হয়েছে। আমি হারুনুর রশীদকে বললাম, এককম অফিসার যদি দশটা থাকে, তাহলে দেশ ঠিক হয়ে যায়। কী হারুন, বলি নাই?’

হারুন হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ে।

মনে হচ্ছে সে কথা কম বলে। কিংবা মাথা নাড়াই তার চাকরি।

‘দেশের আজ যে অবস্থা তা কিন্তু দেশের জনগণের জন্যে না। খারাপ অফিসারের জন্যে। জনগণ কখনো ভুল করে না।’

‘আপনি আমার বিষয়ে কী খোজ পেয়েছেন?’

‘সব খোজই পেয়েছি ভাই। প্রদীপ ছালে উঠলে দূর থেকে টের পাওয়া যায় — আলো দেখা যায়। বুবালেন রহমান সাহেব, আমি খবর পেয়েছি, আপনি অত্যন্ত

অনেস্ট অফিসার। ঘূষ থান না। অন্যায় করেন না। ঠিক শুনি নাই রহমান সাহেব ?'

'জি, ঠিকই শুনেছেন।'

'আপনার নাম রহমান তো ?'

'আব্দুর রহমান আমার নাম।'

'এতবড় একটা কাজ যে আপনি করলেন, অনেস্ট অফিসার বলেই করতে পারলেন। ঘূষ-খায় অফিসারের আত্মা থাকে ছেট — সাহস থাকে না। কী হারুন, আমি এই কথা বলি নাই ?'

হারুন আবার হ্যান্ডেল স্মৃচক ঘাড় নাড়ল।

মনিরুজ্জামান গলা নিচু করে বলল, এত বড় একটা কাজ সুন্দরভাবে করার জন্যে আমি ছেটভাই হিসাবে আপনাকে সামান্য উপহার দিতে চাই। না করবেন না। না করলে মনে ব্যথা পাব।

মনিরুজ্জামান হারুনুর রশীদের দিকে তাকিয়ে ইশারা করল। হারুনুর রশীদ ব্রীফকেস খুলে ব্রাউন পেপারের একটা মোটা মোড়ক ওসি সাহেবের ফাইলের কাছে রেখে ভারী গলায় বলল — ফিফটি আছে।

ওসি সাহেব বললেন, ফিফটি কি ?

'ফিফটি থাইজেন্ড স্যার।'

মনিরুজ্জামান বলল, উপহার কী কিনব, কী আপনার পছন্দ, তা তো জানি না। এই জন্যেই ক্যাশ। পছন্দমত একটা-কিছু কিনে নেবেন ভাই সাহেব। ছেট ভাইয়ের উপর মনে কিছু নিবেন না।

'আচ্ছা।'

'বুঝলেন ভাই সাহেব, খুব ভয়ে ভয়ে ছিলাম। আপনি রাগই করেন কি না। উপহার এক জিনিস আর ঘূষ ভিন্ন জিনিস।'

'তা তো বটেই।'

'এখন ভাই সাহেব, মেয়েটাকে বের করে দেন — ঢাকায় নিয়ে যাই।'

'মেয়েটাকে বলছেন কেন? বলুন স্ত্রীকে বের করে দিন।'

'ও হ্যাঁ হ্যাঁ। অল্পদিন হয়েছে বিয়ে, এখনো অভ্যন্তর হইনি। যাই হোক, আমি স্ত্রীকে নিয়ে যেতে এসেছি। আমার স্ত্রীর যে বড় চাচা উনিও আসছেন। বাই গোড়ে আসছেন।'

ওসি সাহেব শাস্ত গলায় বললেন, ব্যাপারটা আপনি যত সহজ ভাবছেন তত সহজ না। সামান্য জটিলতা আছে।

কী জটিলতা? মনিরুজ্জামান চোখ সরু করে বলল।

'আপনার স্ত্রী জবানবন্দি দিয়েছেন, আপনার সঙ্গে বিয়ে হয়নি। যে রাতে বিয়ে

হিবার কথা সেই রাতে উনি পালিয়ে গেছেন।'

'ও বললে তো হবে না। ও তো এখন এরকম বলবেই। আরো যে জগন্য কিছু
বলে নাই সেটাই আমার সৌভাগ্য। বিয়ে যে হয়েছে তার কাগজপত্র আছে। দেখতে
পারেন। হারুন, কাবিননামাটা দেখাও তো।'

হারুন ব্রীফকেস খুলে কাবিননামা বের করল।

মনিরজ্জামান বলল, খুব ভাল করে দেখেন। আমার স্ত্রীর দস্তখত আছে।
দেখতে পচ্ছেন?

'জ্ঞি!'

'চারজন সাক্ষি আছে। সাক্ষি কারা এইটাও একটু লক্ষ করুন। আপনারা
পুলিশের লোক, কিছুই আপনাদের চোখ এড়াবে না। তবু মনে করিয়ে দেয়।
একজন আছেন মিনিস্টার, প্রতিমন্ত্রী না, আসল মন্ত্রী। একজন আর্মির বিগেডিয়ার,
একজন হচ্ছেন ইউনিভার্সিটির ফুল প্রফেসর। আরেক জন বিশিষ্ট শিল্পপতি এ
আর খান। নাম শুনেছেন আশা করি।

'বলেন কী! এরা সবাই কি আপনার আত্মীয়?

'জ্ঞি না। তবে পরিচিত।'

'সাধারণত দেখা যায়, বিয়েতে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজনরা সাক্ষি হয়। আপনার
বেলাতেই ব্যতিক্রম দেখলাম।'

'আমার সবাই ব্যতিক্রম। দেখলেন না — বোকে বিয়ের পরেই ভাগিয়ে নিয়ে
চলে গেল। তবে হজম করতে পারে নাই — বদহজম হয়ে গেছে। হা-হা-হা।'

'আপনাকে খুব আনন্দিত মনে হচ্ছে।'

'অবশ্যই আনন্দিত। আম ছালা সব ধরা পড়ে গেছে। সাথের বদগুলোকে
মাইল্ড পিটন দিয়েছেন তো?'

'জ্ঞি না, দেই নাই। ভদ্রলোকের ছেলেপুলে, পিটন দিয়ে শেষে কোন বিপদে
পড়ি।'

'কোনো বিপদে পড়বেন না। আমি তো আছি আপনার পিছনে। আমি মানুষটা
ছোটখাট কিন্তু আল্লাহর দয়ায় আমার যোগাযোগ ভাল।'

'সেটা বুঝতে পারছি।'

'অনেকেই বুঝতে পারে না। প্রয়োজন বোধ করলে হেভি পিটন দিয়ে দেন।
এদের চুরির মামলায় ফেলে নাকানি-চুবানি খাওয়ানো যায় ন? আমার স্ত্রীর গায়ে
চার লাখ টাকার জড়োয়া গরন্না ছিল — এই মামলা . . . ধান দেখেছে, বুলবুলি দেখে
নহ। এইবার বুলবুলি দেখবে। ছোট বুলবুলি।'

হারুনের রশীদ বলল, স্যার, আপনি কাইন্ডলি বেগম সাহেবকে বিলিজ করে

দেন। আমরা ঢাকার দিকে রওনা হয়ে যাই। বেলাবেলি পৌছতে হবে।

‘এত সহজে তো ভাই হবে না। মামলা করেছেন, আমরা আসামী কোটে চালান দেব। কোট যা করার করবে।’

‘সে কী?’

‘আপনি মামলা করেছেন ঢাকায় — আমরা আসামী ঢাকা পাঠাব।’

‘তা হলে এত যত্রণার প্রয়োজন নাই। মামলা তুলে নিব। আপনি আমার স্ত্রীকে শুধু রিলিজ করে দিন।’

‘সেটাও সম্ভব না। একটা বেড়াছেড়া লেগে যাবে বলে মনে হয়।’

‘কী বেড়াছেড়া?’

‘যাদের থানা হাজতে আটকে রেখেছি তারা এত সহজে ছেড়ে দেবে তা মনে হয় না।’

‘যারা আমার স্ত্রীকে নিয়ে এসেছে ওদের উপর আমার কোনো রাগ নাই। ছেলেমানুষ ভুল করেছে। মানুষমাত্রই ভুল করে। তা ছাড়া সমস্যাটা মূলত তৈরি করেছে আমার স্ত্রী। কাজেই শাস্তি যা দেবার আমি আমার স্ত্রীকেই দেব। আপনি ওদের ছেড়ে দিন। আমি আমার স্ত্রীকে নিয়ে চলে যাই।’

‘আপনি বিকেলে আসুন।’

‘বিকেলে আসব কেন?’

‘আমি আসতে বলছি এইজন্যে আসবেন।’

‘ওসি সাহেব, আপনি তো ঝামেলা করছেন। আমি ঝামেলা পছন্দ করি না।’

‘ঝামেলা আমি পছন্দ করি না। যহিলাকে আমি ছেড়ে দিলাম, আপনিও গাড়িতে করে জোর করে নিয়ে গেলেন, পরে দেখা গেলো আসলেই আপনাদের বিয়ে হয়নি।’

‘কাগজপত্র দেখালাম না?’

‘কাগজপত্রের দাম নাই।’

‘মনিরুজ্জামান হতভম্ব হয়ে বলল, কাগজপত্রের দাম নাই — কী বলেন আপনি।’

‘মনিরুজ্জামান সাহেব, পুলিশে কাজ করছি দশ বছর ধরে — এই দশ বছরে একটা জিনিস শিখেছি — মানুষের চেয়ে বেশি মিথ্যা বলে কাগজ।’

‘সিগনেচার আপনি বিশ্বাস করেন না?’

‘জি না।’

‘আমি কিন্তু জানি কী করে বিশ্বাস করাতে হয়। বিশ্বাস করাবার মতো ব্যবস্থা নিয়ে আসব।’

‘আসুন। বিশ্বাস করাতে পারলে আমি ওনাকে ছেড়ে দেব। আপনি নিয়ে চলে যাবেন। শাস্তি দিতে চাইলে দেবেন। পথেই কোথাও গলা টিপে মেরে ফেলতে পারেন। আপনার সমস্যা হবে না। ডাক্তারু পোস্টমর্টেম রিপোর্ট আপনার কথামত দেবে। পুলিশও ফাইন্যাল রিপোর্ট যা চাইবেন তাই দেবে।’

‘শুধু আপনি দিবেন না?’

‘জি না।’

‘কেন দিবেন না?’

‘কারণ আমি মানুষটা খারাপ।’

‘আমি ঠিক এক ঘণ্টা পরে আসব।’

‘এক ঘণ্টা পরে এলে হবে না। আপনাকে বিকেলে আসতে বলেছি — আপনি বিকেলে আসবেন।’

‘হাতি ঘোড়া গেল তল, চার পয়সার ওসি বলে কত জল?’

ওসি সাহেব হাই তুললেন। মনিরজ্জামান বলল, মেয়েটা কোথায়? আমি ঐ মেয়েটার সঙ্গে কথা বলব। নাকি আমাকে কথাও বলতে দেবেন না?

‘দেব। কথা বলতে দেব।’

মনিরজ্জামান হারংনুর রশীদের দিকে তাকিয়ে ইশারা করল।

হারংনুর রশীদ অত্যন্ত স্বাভাবিক ভঙ্গিতে পঞ্চাশ হাজার টাকার ব্রাউন পেপারের প্যাকেট হাতে নিয়ে বাট করে ব্রীফকেসে ভরে ফেলল। কাজটা সে করল দেখার সঙ্গে কী যেন দেখছে। জরী বলল, তুমি কী দেখ?

পাগলী নতুন শাড়ি পরেছে। মাথায় চুল আঁচড়েছে। তাকে আর চেনা যাচ্ছে না। সে নিজেও মনে হয় হকচকিয়ে গেছে। চুপচাপ বসে আছে, কোনোরকম হৈচৈ করছে না। কিছুক্ষণ পরপর নিজের দুটা হাত তার চোখের সামনে ধরে গভীর মনোযোগের সঙ্গে কী যেন দেখছে। জরী বলল, তুমি কী দেখ?

পাগলী হাসল।

‘নাম কী তোমার?’

পাগলী জবাব দিল না।

‘তোমার কি শাড়িটা পছন্দ হয়েছে?’

পাগলী হ্যাস্য-সূচক মাথা নাড়ল এবং আবারও তার দুটা হাত চোখের সামনে মেলে ধরল।

মুনা বলল, জরী আপা, মেয়েটাকে কী সুন্দর লাগছে দেখছেন?

‘হ্যাঁ, দেখছি।’

‘এত সুন্দর একটা মেয়ে পথে পথে ঘোরে ! আশচর্য !’

নইমা শুয়ে আছে। কম্বল বিছানো হয়েছে। কম্বলের উপর ফুলতোলা নতুন চাদর। নতুন বালিশ। সবই কিনে আনানো হয়েছে। নইমা বালিশে মাথা রেখেই শুমুছে। তার জ্বর এসেছে। মূনা বসে আছে নইমার মাথার কাছে।

আনুশক্তা বলল, ওর জ্বর কি বেশি মূনা ?

‘হঁ !’

‘সমস্যা হয়ে গেল তো !’

‘আপনাকে দেখে কিন্তু মনে হচ্ছে না আপা কোনো সমস্যা আছে। শান্তমুখে বসে আছেন !’

আনুশক্তা হাসল। মূনা বলল, আপা, আমাদেরকে কি ওরা এখানে রাতেও আটকে রাখবে ?

‘না, ছেড়ে দেবে। সন্ধ্যার আগেই ছেড়ে দেবে।’

‘কীভাবে বলছেন ?’

‘আমাদের সঙ্গে শুভ্র আছে না ? শুভ্র কোনো সমস্যা তার বাবা-মা হতে দেবেন না !’

‘ওনারা তো আর জানেন না এখানে কী হচ্ছে !’

‘ইতিমধ্যে জ্ঞেন গেছেন বলে আমার ধারণা। তাঁরা তাঁদের ছেলের উপর লক্ষ রাখবেন না, তা হয় না !’

আনুশক্তার কথার মাঝখানেই মনিরজ্জামান এসে দাঁড়াল। জরী হতভঙ্গ হয়ে তাকিয়ে আছে। ভূত দেখলেও কেউ এত চমকায় না।

মনিরজ্জামান বলল, খেল তো ভাল দেখালে। যাই হোক, এখন সমস্ত খেলার অবসান হয়েছে। বিকেলে তোমাকে নিয়ে ঢাকা রওনা হব।

‘আমাকে নিয়ে ঢাকা রওনা হবেন মানে ? আমি আপনার সঙ্গে ঢাকা যাব কেন ?’

‘স্বামীর সঙ্গে কোথাও যাবে না, এটা কেমন কথা ?’

‘আপনি আমার স্বামী ?’

‘অবশ্যই। বিয়ের কাবিননামাও নিয়ে এসেছি। ওসি সাহেবকে দেখালাম।’

‘বিয়ের কাবিননামা ?’

‘এক লাখ এক টাকা কাবিনের কাবিননামা। বিকেলের মধ্যে তোমার বড় চাচাও চলে আসবেন।’

জরীর মুখে কথা আটকে গেল। কী-একটা কথা অনেক বার বলতে গিয়েও বলতে পারল না।

মনিরুজ্জামান হষ্ট গলায় বলল, আছা যাই — দেখা হবে বিকেলে।

জরী তাকাল আনুশকার দিকে। আনুশকা হাসছে। আনুশকার হাসি দেখে পাগলীও হাসতে লাগল। এতে নহিমার ঘূম ডেঙে গেলো। সে উঠে বসল এবং আনন্দিত গলায় বলল, কী হয়েছে? কী হয়েছে?

মনিরুজ্জামান আর দাঁড়াল না। তার অনেক কাজ বাকি আছে। কাজ শেষে করতে হবে। নষ্ট করার মতো সময় হাতে নেই। ওসির স্ক্রু টাইট দিতে হবে, তবে যাবার আগে দলের ছেলেগুলিকে দেখে যাওয়া দরকার।

রানা দেখল, থ্রী পিস সৃষ্টিপুরা এক ভদ্রলোক আসছেন। সে উৎসাহের সঙ্গে উঠে বসল। মনে হচ্ছে গুফত্বপূর্ণ কেউ আসছে। তাদের মুক্তির ব্যবস্থা হচ্ছে। রানাই আগ বাড়িয়ে বলল, স্নায়ালিকূম।

মনিরুজ্জামান বলল, ওয়ালাইকূম সালাম। আপনারা ভাল?

‘জি স্যার, আছি মোটামুটি।’

‘কষ্ট হয়নি তো?’

মোতালেব বলল, কোনো কষ্ট হয়নি। অত্যন্ত আনন্দে সময় কাটছে। ‘সময়’ কি ব্যাপার আগে জানতাম না। এখন জানি। আরো বৎসরখানেক এখানে থাকতে পারলে সায়েন্সের অনেক কিছু শিখতাম। আপনাকে তো ভাই চিনতে পারছি না — আপনার পরিচয়?

‘আমার নাম মনিরুজ্জামান। আমি জরীর হাসবেন্ড।’

‘কার হাসবেন্ড?’

‘জরীর। আমি তাকে নিতে এসেছি। বিকেলে ওকে নিয়ে চলে যাব। আপনারা যেখানে যাচ্ছেন চলে যান। আপনাদের উপর আমার কোনো রাগ নেই। আপনাদের একটু সমন্য হল — তার জন্যে আমার স্ত্রীর হয়ে আমি আপনাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।’

রানা বলল, কী বললেন? আপনি কে?

‘জরীর হাসবেন্ড।’

শুন্দি বিশ্বিত হয়ে বলল, জরী তো বিয়ে করেনি!

মনিরুজ্জামান হাসিমুখে বলল, আপনাদের তাই বুঝিয়েছে, ঘটনা ভিন্ন। বিয়ে হয়েছে, কাবিন হয়েছে। এক লক্ষ এক টাকা মোহরানা। যাই, কেমন? খোদা হাফেজ।

মনিরুজ্জামান হনহন করে এগুচ্ছে। তার পেছনে হারুনুর রশীদ। হারুনুর রশীদ যে এতটা লম্বা তা আগে বোঝা যায়নি। এখন বোঝা যাচ্ছে। তাকে দেখে মনে

হচ্ছে, একটা তালগাছ ব্রীফকেস হাতে কুঁজে হয়ে দাঢ়িয়ে আছে।

দলের সবাই খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে রইল। সঙ্গু বলল, অবস্থা ভাল মনে হচ্ছে না। শুভ, তুই কি একটা কাজ করবি?

‘কী কাজ?’

‘তুই তোর বাবাকে টেলিফোন করে ঘটনাটা বলবি? জরীকে একটা লোক জোর করে ধরে নিয়ে চলে যাবে — আর আমরা যাব দারুচিনি দ্বিপে! তা কী করে হয়?’

শুভ চূপ করে আছে। সঙ্গু বলল, কথা বলছিস না কেন?

‘বাবাকে কী বলব?’

‘তোর কিছু বলতে হবে না। তোর বাবাই তোর ভেতর থেকে সব কথা টেনে বের করে নিয়ে আসবেন।’

শুভ অস্বস্তির সঙ্গে চূপ করে আছে। রানা রাণী ভঙ্গিতে বলল, তুই এমন স্টোন ফেস হয়ে গেলি কেন? বাবার সঙ্গে কথা বলতে লজ্জা লাগছে?

শুভ বলল, বাবাকে কিছু বলার দরকার নেই।

‘বলার দরকার নেই কেন?’

‘আমার ধারণা বাবা সবই জানেন।’

‘গাধার মতো কথা বলবি না শুভ। তোর বাবা কোনো পীর-ফরিদ না যে সব জানে। তোকে টেলিফোন করতে বলা হয়েছে, তুই টেলিফোন করবি এবং কাঁদে—কাঁদে গলায় বলবি, আমাদের বক্ষা করো। এস ও এস। বাঁচও বাঁচাও।’

‘এরা কি আমাদের টেলিফোন করতে দেবে?’

‘এহঠা একটা টেকনিক্যাল কথা বলেছিস। তোকে টেলিফোন করতে দেবে কি না সেটা হচ্ছে কথা। সম্ভবত দেবে না — তবে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।’

বল্টু বলল, প্রয়োজনে আমি ওসি সাহেবের পা চেপে ধরব। অনেক ধরনের মানুষের পা ধরেছি, পুলিশের পা কখনো ধরিনি। পা ধরে সবচে’ বেশি মজা কখন পেয়েছিলাম জানিস? একবার এর পীর সাহেবের পা ধরেছিলাম — কী মোলায়েম পা! ধরলে ছাড়তে হিচ্ছা করে না।

শুভ ওসি সাহেবের সামনে বসে আছে। ওসি সাহেব টেলিফোন সেট তার দিকে বাঢ়িয়ে বললেন, নিন, টেলিফোন করুন।

শুভ বিশ্বিত মুখে বলল, আমি নায়ার ভুলে গেছি।

‘নাম্বার ভুলে গেছেন মানে? নিজের বাসার নাম্বার মনে নেই?’

‘জি না। বাসায় তো কখনো টেলিফোন করা হয় না। তবে আমার হ্যান্ডব্যাগের পকেটে একটা ডায়েরি আছে — সেখানে নাম্বার লেখা আছে।’

‘আচ্ছা, হ্যান্ডব্যাগ আনিয়ে দিচ্ছি।’

শুভ্র ভায়েরির জন্যে অপেক্ষা করছে। ওসি সাহেব কোতুল এবং আগৃহ নিয়ে
শুভ্রকে দেখছেন।

টেলিফোন ধরলেন শুভ্র মা। শুভ্র বলল, মা, কেমন আছ?

রাহেলা প্রায় হাহকার করে উঠলেন, তুই কেমন আছিস বাবা?

‘ভাল।’

‘তোর চশমা! তোর চশমা আছে?’

‘হ্যাঁ, আছে।’

‘খাওয়াদাওয়ার কি কোনো সমস্যা হচ্ছে?’

‘না, কোন সমস্যা হচ্ছে না।’

‘বাইরের পানি খাচ্ছিস না তো?’

‘উহুঁ।’

‘একসঙ্গে বেশি করে পানির বোতল কিনে নে।’

‘আচ্ছা মা, নেব।’

‘গত রাতে ভাল ঘুম হয়েছিল তো?’

‘হ্যাঁ।’

‘এসিকে আমি সারা রাত ঘুমুতে পারিনি। শুধু দুঃস্বপ্ন দেখেছি। শুভ্র, তুই ভাল
আছিস তো?’

‘আমি ভাল আছি মা।’

‘তোর বন্ধুরা? ওরা ভাল আছে তো?’

‘হ্যাঁ, ওরাও ভাল আছে। আচ্ছা মা, বাবা কি অফিসে, না বাসায়?’

‘তোর বাবা বাসায়। আজ কোথাও যায়নি। ওর শরীরটা নাকি ভাল না।’

বাবা কী করছেন?

‘বিছানায় শুয়ে শুয়ে রেঞ্চ নিচ্ছে। বই পড়ছে।’

‘কী বই পড়ছেন মা?’

‘কী বই পড়ছে তা তো দেখিনি — দেখে আসব?’

‘না, তুমি বাবাকে দাও।’

‘তুই আমার সঙ্গে আরেকটু কথা বল শুভ্র। তারপর তোর বাবাকে দেব।’

‘উহুঁ, তুমি আগে বাবাকে দাও। তারপর আমি আবার তোমার সঙ্গে কথা বলব।’

‘তুই কি আমাকে মিস করছিস শুভ্র?’

‘হ্যাঁ। মা, তুমি বাবাকে দাও।’

ইয়াজউদ্দিন সাহেব টেলিফোন-রিসিভার হাতে নিয়ে ভারী গলায় বললেন,

হ্যালো।

শুভ বলল, বাবা, তুমি কী বই পড়ছ? তোমার হাতে এখন কী বই?

‘বহটার নাম হল “Moon is down”.

শুভ খুশি-খুশি গলায় বলল, তুমি আমার টেবিল থেকে বহটা নিয়েছ, তাই না?
‘ইঁ।’

‘এটা তোমার জন্মদিনে দেব বলে আনিয়ে রেখেছিলাম। প্যাকেট করা বই তুমি খুললে কেন? না বলে প্যাকেট খোলা তো নিষেধ।’

‘মানুষের প্রকৃতি এমন যে সে সবসময় নিষেধ অমান্য করে।’

‘বহটা তোমার কেমন লাগছে বাবা?’

‘ভাল, খুব ভাল।’

‘তোমার কি চোখে পানি এসেছে?’

‘এখনো আসেনি।’

‘পঞ্চাশ পঞ্ঠার পর থেকে দেখবে — একটু পরপর চোখ ভিজে উঠেছে। তুমি ক’ পঞ্ঠা পর্যন্ত পড়েছ?’

‘কুড়ি-পাঁচিশ পঞ্ঠা হবে।’

‘বাবা, তোমার সঙ্গে আমার খুব জরুরি কয়েকটা কথা আছে।’

‘এখন তুমি ছুটি কঢ়াতে গেছ, এখন আবার জরুরি কথা কী? এখন শুধু হালকা কথা বলবে।’

‘কথাটা খুব জরুরি বাবা।’

‘আমি তোমার কোনো জরুরি কথা শুনতে চাছি না।’

‘বাবা, আমরা খুব বিপদে পড়েছি।’

‘মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করেছ, বিপদে তো পড়বেই। বিপদে পড়বে, আবার বিপদ থেকে বের হয়ে আসবে। আবার পড়বে। দিস ইজ দ্যা গেম।’

‘পুলিশ আমাদের ধরে এনে হাজতে রেখে দিয়েছে।’

‘ও, আছা।’

আমাদের সঙ্গে জরী নামের যে মেয়েটি আছে — তার হাসবেন্ড এসেছে তাকে নিয়ে যেতে।

‘হাসবেন্ড নিয়ে যেতে চাইলে তো তোমরা কিছু করতে পারবে না। পুরুষ-শাসিত সমাজে স্বামীর অধীকার স্বীকৃত।’

‘লোকটির সঙ্গে জরীর বিয়ে হয়নি। লোকটা মিথ্যা কথা বলছে। মিথ্যা কথা বলে মেয়েটিকে নিয়ে যেতে চাচ্ছ।’

‘উল্টেটাও তো হতে পারে। হয়তো মেয়েটাই মিথ্যা বলছে। মেয়েরা পুরুষদের চেয়েও গুছিয়ে মিথ্যা বলতে পারে। একজন পুরুষ যখন মিথ্যা কথা বলে তখন বোঝা যায় সে মিথ্যা বলছে। কিন্তু একটা মেয়ে যখন মিথ্যা বলে তখন বোঝার কোনো উপায়ই নেই সে মিথ্যা বলছে।’

‘তুমি খুবই অস্ত্রুত কথা বলছ বাবা।’

‘এটা আমার কথা না। যে বহুটা এই মুহূর্তে আমি পড়ছি সেই বহুয়ের নায়ক বলছে, তোর প্রিয় বহু Moon is down-এই এটা লেখা।’

‘ঐ লোকটা একটা ফ্রড বাবা। ওর প্রতিটি কথাই মিথ্যা।’

‘ও, আচ্ছা।’

‘বাবা শোনো — আমরা ভয়ংকর বিপদে পড়েছি। তুমি কি কিছু করতে পার আমাদের জন্যে?’

‘না।’

‘না কেন?’

‘আমি তোমাকে বিপদে ফেলিনি, কাজেই বিপদ থেকে তোমাকে টেনে তোলার দায়িত্বও আমার নয়। তুমি স্বাধীনতা চেয়েছ, তোমাকে স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। বন্ধু-বাঞ্ছব নিয়ে রওনা হয়েছে। এখন তুমি ছট করে আমার সাহায্য চাহিতে পার না।’

শুভ চুপ করে রাখিল। ইয়াজউদ্দিন সাহেব বললেন, তা ছাড়া আমি সারা জীবন বেঁচে থাকব না। এ জীবনে আমি যা সংক্ষয় করেছি সেইসব রক্ষার দায়িত্ব তোমার। আজ যদি এই সামান্য বিপদ থেকে নিজের চেষ্টায় বের হতে না পার, তা হলে ভবিষ্যতে বড় বড় বিপদ থেকে উদ্ধার পাবে কী করে? বুঝতে পারছ আমি কী বলছি?

‘পারছি।’

‘যখন কোনো সমস্যা আসবে তখন সমস্যাটাকে একটা বন্ধুর মতো তোমার সামনের তেবিলে রাখবে। নানান দিক থেকে সমস্যাটা দেখবে। একসময় লক্ষ করবে সমস্যাটার একটা দূর্বল দিক আছে। তুমি আক্রমণ করবে দূর্বল দিকে।’

‘আমার সমস্যার দূর্বল দিক কোনটা বাবা?’

‘যে লোক সমস্যা তৈরি করেছে, মেয়েটির হাসবেন্ড বলে যে নিজেকে দাবি করছে সেই সবচে দূর্বল। সে দুর্গ তৈরি করেছে মিথ্যার উপর। এ-জাতীয় লোকেরা ভীতু প্রকৃতির হয়। এদের ভয় দেখালে ওরা অসম্ভব ভয় পায়। এদের ভয় দেখাতে হয়। ছোটখাট ভয় না। বড় ধরনের ভয়।’

‘ভয় কীভাবে দেখাব?’

‘সেটা তুমি জান কীভাবে ভয় দেখাবে।’

‘আমি ভয় দেখালেই সে ভয় পাবে কেন?’

‘তুমি ভয় দেখালে সে ভয় পাবে, যদি সে জানে তুমি কে। তোমার ক্ষমতা কী?’

‘বাবা, আমার তো কোনো ক্ষমতা নেই?’

‘তোমার ক্ষমতা হচ্ছে তোমার অর্থ। তোমার সঙ্গে চেকবই আছে না?’

‘হ্বি, আছে।’

‘তুমি যদি চেকবই বের করে এক কোটি টাকার একটা চেক লিখে দাও, সেই চেক ফেরত আসবে না। ব্যাংক সেই চেক অনার করবে। এইখানেই তোমার ক্ষমতা। এই ক্ষমতা দিয়ে তুমি যে-কোনো মানুষকে ভয় দেখাতে পার।’

‘কিন্তু বাবা, এই ক্ষমতা তো মিথ্যা ক্ষমতা।’

‘হ্যাঁ, এই ক্ষমতা মিথ্যা। কোনো ক্ষমতাবান লোকই এই ব্যাপারটা জানে না। তুমি জান। That's the best thing about you. শুভ, অনেকক্ষণ কথা হল, এখন টেলিফোন রাখি?’

‘তুমি আর কিছু বলবে না বাবা?’

‘হ্যাঁ, বলব। I love you my son. এবং তুমি তোমার “মুন ইজ ডাউন” বইটিতে আমার সম্পর্কে যে উক্তি করেছ তা আমি পড়েছি। খ্যাংক যুৰ।’

ইয়াজউদ্দিন টেলিফোন নামিয়ে রেখে হাতের বই খুললেন। প্রথম পাতায় শুভ সবুজ কালি দিয়ে লিখে রেখেছে —

বাবা,

জ্যোতিন শুভেজ্জা।

আমার খুব ইচ্ছা করে আমি তোমার মতো হই।

শুভ।

ইয়াজউদ্দিন দীঘনিঃশ্঵াস ফেলে মনে মনে বললেন, শুভ শুভের মতোই থাকুক। ওকে আমার মতো হতে হবে না।

রাহেলা বললেন, তুমি টেলিফোন রেখে দিলে কেন? আমি শুভের সঙ্গে কথা বলতাম।

‘স্যারি। আমি আবার যোগাযোগ করে দিচ্ছি।’

‘না লাগবে না।’

রাহেলার চোখে পানি এসে গেছে। তিনি চোখ মুছছেন।

ওসি সাহেব বললেন, শুভ সাহেব, আপনার টেলিফোনের কথা তো শেষ হয়েছে।

‘ছি।’

‘কী বললেন আপনার বাবা?’

‘বাবা আমাকে মনিকুজ্জামান নামের ঐ লোকটার সঙ্গে কথা বলতে বললেন।’

‘কথা বলবেন?’

‘ছি, কথা বলব।’

‘উনি চলে এসেছেন। আমি ডেকে দিছি। আপনারা কথা বলুন। নিরিবিল কথা বলুন।’

‘ওসি সাহেব, আপনিও থাকতে পারেন।’

মনিকুজ্জামান এসে বসল শুভ্র সাফনের চেয়ারে। মনিকুজ্জামানের পাশে বসেছে হাফনূর রশীদ। সে কৌতুহলী হয়ে শুভ্রকে দেখছে।

শুভ্র বলল, প্লামালিকুম।

‘ওয়ালাইকুম সালাম। আমি আপনাকে চিনতে পারিনি ভাই। আপনি ইয়াজউদ্দিন সাহেবের ছেলে। বাহ, ভাল। আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুব আনন্দিত হয়েছি। ছি ছি, এটা তো বিরাট লজ্জার ব্যাপার হয়ে গেল, ইয়াজউদ্দিন সাহেবের ছেলে কিনা হাজতে! ইয়াজউদ্দিন সাহেবের কাছে তো মুখ দেখাতে পারব না।’

শুভ্র বলল, আপনি আমাদের এই ঝামেলা দূর করবেন, আশা করি।’

‘অবশ্যই, অবশ্যই। আমি ওসি সাহেবকে বলে দিয়েছি। আপনাদের উপর থেকে যত চার্জ ছিল সব তুলে নেয়া হয়েছে। আপনারা আপনাদের ঘরতো বেড়াতে যাবেন। আমি আমার স্ত্রীকে নিয়ে ফিরে যাব।’

‘জরীও আমাদের সঙ্গে যাবে।’

‘কী বললেন?’

শুভ্র শান্তমুখে বলল, আপনি যথেষ্ট যন্ত্রণা করেছেন। তার পরেও আপনাকে ক্ষমা করেছি। এরচে’ বেশি যন্ত্রণা করার চেষ্টা করলে ক্ষমা করব না।

‘কী করবেন?’

‘আপনি জীবিত ঢাকা ফিরবেন না।’

‘কী বললেন?’

‘এই বাক্যটি আমি দ্বিতীয়বার বলব না। তবে যে বাক্যটি বলা হয়েছে — তা কার্যকর করার সমস্ত ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এই তথ্যটা আপনার জ্ঞান থাকা দরকার।’

শুভ উঠে দাঁড়াল। মনিরুজ্জামান বলল, আরে বসেন, বসেন। রাগ করে উঠে যাচ্ছেন কেন? চা খান। ওসি সাহেব, আমাদের একটু চা খাওয়ার ব্যবস্থা করেন—না রে ভাই।

শুভ বলল, আমি চা খাই না।

মনিরুজ্জামান হাত ধরে টেনে তাকে বসিয়ে ফেলল। হাসিমুখে বলল, আমাদের মধ্যে একটা ভুল বোঝাবুঝি থাকবে এটা কেমন কথা? আমরা আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে . . .

‘এখানে আলাপ-আলোচনার কিছু নেই।’

‘আচ্ছা, না থাকলে নাই। চা তো খাওয়া যাবে। আসার সঙ্গে চা খেতে তো অসুবিধা নেই?’

‘অসুবিধা আছে।’

ওসি সাহেব হাই তুলতে তুলতে বললেন, শুভ সাহেব, ঢাকা থেকে আপনার কাছে এক ভদ্রলোক এসেছেন। রফিক নাম। উনি থানার বাহিরে অপেক্ষা করছেন। আপনি কি ওনার সঙ্গে কথা বলবেন?

শুভ বলল, ওনাকে অপেক্ষা করতে বলুন।

মনিরুজ্জামানের মুখ ছাইবর্ণ হয়ে গেল। সে পরপর দুবার ঢেক গিলল।

শুভ দেখল তার বাবার কথাই ঠিক হয়েছে। ভয় কাজ করছে।



থানার সামনে পথটিনের এসি বসানো মাইক্রোবাস অপেক্ষা করছে। মাইক্রোবাসের পেছনে একটি পাজেরো গাড়ি। পাজেরোতে সুলেমান অপেক্ষা করছে। সে টেকনাফ পর্যন্ত যাবে। সুলেমানের সঙ্গে আরো দুজন। এই দুজনের চোখ ছোট ছোট, হাব-ভাব কেমন কেমন। এরা কখনো চোখে চোখে তাকায় না। কথা বলে মাটির দিকে তাকিয়ে। দুজনের গায়েই চামড়ার জ্যাকেট। থানার বারান্দায় বফিক সাহেবও হাঁটাইঁটি করছেন।

শুভ বের হতেই রফিক সাহেব এগিয়ে গেলেন। শুভ বলল, আপনি এখানে?

ରୁଫିକ ସହଜଭାବେ ବଲଲେନ, ଚିଟାଗଂ-ଏ ଏକଟା କାଜ ଛିଲ — ଏସେହିଲାମ । ଆଜହି ଢାକା ଫିରେ ଯାବ । ଭାବଲାମ, ଆପନାର ସଙ୍ଗେ ଦେଖା କରେ ଯାଇ । ମ୍ୟାରକେ କିନ୍ତୁ ବଲତେ ହବେ ?

‘ନା, କିଛୁ ବଲତେ ହବେ ନା ।’

‘আপনারা কি আজ রাতটা চিটাগাং থাকবেন? না কি রাতেই কল্পবঙ্গাব চলে যাবেন?’

‘বুত্রতে পারছি না। আগমার বন্ধু রানা এইসব দেখছে। সে যা ঠিক করে, তাই।’

‘সুলেমান একটা ব্যবস্থা করে রেখেছে। আগাম মনে হয় সেইটাই ভাল ব্যবস্থা হবে। ছোটখাট সমস্যা যেহেতু হচ্ছে . . .’

‘की व्यवस्था?’

‘প্যটনের মাইক্রোবাস যাবে। আপনারা সবাই বেশ আরাম করে যেতে পারবেন। পেছনে পেছনে সুলমান যাবে পাজেরো জীপ নিয়ে। দুজন বডিগার্ডও আছেন। এ ছাড়াও এসপি সাহেবের সঙ্গে কথা হয়েছে। তিনি পুলিশ এসকর্টের ব্যবস্থা করেছেন। পুলিশের একটা জীপ আগে আগে যাবে। টেকনাফ পর্যন্ত যাবে। আমি বলছি কি — আপনারা সবাই খাওয়াদাওয়া করে মাইক্রোবাসে উঠে বসুন এবং এক টানে চলে যান টেকনাফ। এটাই ‘সবচে’ ভাল বুদ্ধি।’

‘ভাল বুদ্ধি মন্দ বুদ্ধি না। আমাদের টীম লীডার হল রানা। ও যা বলে তাই করা হবে। আপনি গাড়ি-টাড়ি নিয়ে চলে যান।’

‘ଜୀ ଆଶ୍ରା ।’

'আর সুলেমানকে বলুন সে যেন আর আমার পেছনে পেছনে না আসে।'

'জি আচ্ছা, বলে দিছি। আপনাদের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা শুধু করি —
সারা দিন খাননি, আমারই খারাপ লাগছে।'

'কিছু করতে হবে না।'

'আমি ব্যবস্থা করে রেখেছিলাম।'

'না। পীজ না।'

'খাবারগুলি প্যাকেট করে পোছে দিই ?'

'আপনাকে কিছু করতে হবে না।'

'আমি কি তা হলে চলে যাব ?'

'হ্যাঁ, চলে যাবেন। দলবল নিয়ে যাবেন। Leave us alone.'

'জি আচ্ছা। আপনার খুব কষ্ট হল !'

'কষ্ট কিছু হয়নি। আমি অনেক কিছু শিখেছি। রফিক সাহেব, আপনার সঙ্গে
কি সিগারেট আছে ? একটা সিগারেট দিন তো।'

রফিক বিশ্বিত হয়ে তাকালেন। তাঁর কাছে সিগারেট ছিল না। তিনি সিগারেট
আনতে নিজেই চলে গেলেন। শুভ দাঁড়িয়ে আছে।

হাজতের দরজা খোলা হয়েছে। ওসি সাহেব দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি আনুশকার দিকে
তাকিয়ে বললেন, আপনারা বের হয়ে আসুন।

'আমাদের কি ছেড়ে দিচ্ছেন ?'

'জি।'

'জরীর কী হবে ? ও কি ঐ বদমাশটার সঙ্গে যাবে, না আমাদের সঙ্গে যাবে ?'

'সেটা উনি ঠিক করবেন। উনি যদি আপনাদের সঙ্গে যেতে চান, তা হলে
যাবেন। আবার যদি মনিকৃষ্ণামান সাহেবের সঙ্গে যেতে চান, তাও যেতে পারেন।'

'থ্যাংক যুজ ওসি সাহেব। আপনি কি আরেকটা ছোট্ট কাজ করবেন ?'

'কাজটা কী বলুন, দেখি পারি কি না।'

'আমি এই পাগলীটাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চাই।'

'ওকে নিয়ে কী করবেন ?'

'আমি ওর চিকিৎসা করাব। সুস্থ করে তুলব।'

'মিস আনুশকা, এইসব শখ ক্ষণস্থায়ী হয়। কিছুদিন পর দেখবেন অসহ্য বোধ
হচ্ছে। না পারছেন গিলতে, না পারছেন উগরে ফেলে দিতে। বরং সে এখানে
থাকুক। আমি কোনো—একটা মহিলা সংগঠনে পাঠিয়ে দেব। যোগাযোগ করছি।'

'আমার সঙ্গে দিয়ে দিতে আইনগত কোনো বাধা আছে ?'

‘না, আইনগত কোনো বাধা নেই।’

‘তা হলে ও আমাদের সঙ্গে যাচ্ছে।’

ওসি সাহেব হেসে ফেললেন। আনুশকা বলল, যেরেটার নাম কী?

‘ওর নাম—টাম নেই — বা থাকলেও এখন কেউ জানে না।’

‘না থাকলেই ভাল। আমি ওর নতুন একটা নাম দেব।’

নইমা ঘুমুচ্ছে। মুনা অনেক চেষ্টা করেও তার ঘূম ভাঙতে পারছে না। আনুশকা
বলল, মুনা, ভাল করে দেখ, যবে—টরে যায়নি তো?

মুনা হেসে উঠল খিলখিল করে। মুনার সঙ্গে পাগলীটাও হাসতে শুরু করল।
তার হাসি আর থামে না। হাসির শব্দে ঘূম ভাঙল নইমার। সে হতচকিত গলায়
বলল, কী হয়েছে? কী হয়েছে? মুনা হাসতে হাসতে বলল, আপা, আমাদের ছুটি
হয়ে গেছে। আমরা এখন যাচ্ছি।’

‘কোথায় যাচ্ছি?’

‘দারুচিনি দীপ।’

‘আমি কোথাও যাব না। আমি ঢাকা চলে যাব। আনুশকা, আমাকে ঢাকা
পাঠাবার ব্যবস্থা কর। অসম্ভব, আমি তোদের সঙ্গে যাব না। মরে গেলেও না। মরে
গেলেও না। মরো গেলেও না।’

‘আচ্ছা আচ্ছা, তোকে ঢাকা পাঠাব। এরকম করিস না তো! গায়ে কি এখনো
জ্বর আছে?’

মুনা বললো, হ্যাঁ আপা, জ্বর আছে। বেশ জ্বর।



জরী বলল, আমি একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি না। আমরা রেল-স্টেশনে বসে আছি কেন?

রানা রাগী গলায় বলল, রেল-স্টেশনে বসে আছি, কারণ এক জায়গায় বসে আলাপ-আলোচনা করে ডিসিশান নিতে হবে।

‘কী ডিসিশান?’

‘ডিসিশান হচ্ছে — আমরা কি আজ রাতেই কঞ্চিবাজার রওনা হব, না আজ রাতটা চিটাগাং-এ থেকে পরদিন ভোরে রওনা হব?’

‘ডিসিশান নিছ না কেন?’

‘ছট করে তো আর ডিসিশান নেয়া যায় না। চিন্তা-ভাবনার ব্যাপার আছে। আনুশক্তা, তোমার কী মত?’

আনুশক্তা হাই তুলতে তুলতে বলল, তুমি হচ্ছ দলপতি। তুমি ডিসিশান নেবে। তুমি যা বলবে তাই হবে। তুমি যদি বল, রাত তিনটায় রওনা হবে — ফাইল উইথ মি।

বলটু বলল, আমাদের খাওয়া দাওয়ার কী হবে রে রানা? খিদেয় মরে যাচ্ছি।

‘খিদেয় মরে যাবি কী জন্যে? একটু আগে সবাইকে দেড় ফুট সাহজের একটা কলা খাওয়ালাম না?’

‘এই কলাই কি আমাদের ডিনার?’

‘আচ্ছা একটা কথা, আমরা কি খাওয়া দাওয়া করার জন্যে বের হয়েছি, না আমাদের অন্য উদ্দেশ্যে আছে?’

নীরা বলল, ক্ষুধার্ত অবস্থায় কিছুই ভাল লাগে না রানা। সুকান্তের মতো কবির কাছেও ক্ষুধার্ত অবস্থায় পৃষ্ঠিমার চাঁদকে ঝলসানো ঝটির মতো মনে হয়েছে।

‘হবে, খাবার ব্যবস্থাও হবে। আগে বাসার খোখবর করে দেখি। মোতালেব, তুই আয় আমার সঙ্গে।’

‘আমি যাৰ কী জন্যে? আমি তো আৱ দলপতি না, কিংবা দলপতিৰ অ্যাসিস্টেন্টও না।’

ରାନା ରାଗ କରେଓ ବେର ହୟେ ଗେଲ ।

ସମ୍ଭା ହୟେ ଗେଛେ । ଏଥିନ କରୁବାଜାରେ ରଙ୍ଗଳା ହେଯା ଠିକ ହବେ ନା । ପଥେ କୋନୋ ବିପଦ-ଆପଦ ହୟ କି ନା କେ ବଲବେ ? ଡଙ୍ଗଲେର ଭେତର ଗାଡ଼ିର ଚାକା ପାଂଚର ହୟେ ଗେଲେ । ଚାକା ଠିକ କରା ହଚ୍ଛେ, ଏବ ମଧ୍ୟେ ବେରିଯେ ଏଲ ଏକଦଲ ଡାକାତ । ସଙ୍ଗେ ଏତଗୁଲି ମେଯେ . . . ରିମ୍ବକ ନେଯା ଯାବେ ନା । ରାତଟା ଏଖାନେହି ଥାକତେ ହବେ । ଷେଷନେର ପ୍ଲ୍ୟାଟଫର୍ମେ କାଟାତେ ହବେ । ହୋଟେଲ ନେଯାର ପ୍ରଶ୍ନାଇ ଆସେ ନା । ଏତ ଟାକା ହୋଟେଲେଓୟାଲାକେ ସେ କେନ ଖାମାଖା ଦେବେ ? ତା ଛାଡ଼ା ଅନେକ ଟାକା ବାଜେଟେର ଅତିରିକ୍ତ ଖରଚ ହୟେଛେ । ଆଗେ ଯେ ବାସା ଠିକ କରା ହୟେଛିଲ ତାକେ ଟାକା ଦିତେ ହୟେଛେ । ଆର ଏକଟା ରାତ ଷେଷନେର ପ୍ଲ୍ୟାଟଫର୍ମେ କାଟାନୋ ଏମନ କିଛୁ ନା ।

ରାନା ଭୋରେ ରଙ୍ଗଳା ହୁବାର ଜନ୍ୟ ବାରୋ ସୀଟାରେର ଏକଟା ଲକ୍ଷ ମୂଡିର ଟିନ ମାର୍ବା ମାଇକ୍ରୋବାସ ଠିକ କରଲ । ସେ-ଇ ସବଚେ' କମ ଭାଡ଼ାଯ ଯେତେ ରାଜି ହୟେଛେ ।

ରାତର ଖାବାର କିନେ ଫିରଲ । ପରୋଟା-ଗୋଶତ ।

ଆନୁଶକା ପରୋଟା ହାତେ ନିଯେ ବଲଲ, ଗୋଲ ଗୋଲ ଏହି ଜିନିମଞ୍ଚଲି କି ?

ରାନା ଥମଥମେ ଗଲାଯ ବଲଲ, କେନ, ପରୋଟା କଥନୋ ଖାଓନି ?

'ଖେଯେଛ । ଲୋହାର ତୈରି ପରୋଟା ଖାଇନି । ଏଇଗୁଲି କୀଭାବେ ଖାଯ ?'

'ଖେତେ ନା ଚାହିଲେ ଖାବେ ନା । ଆମାକେ ବାଜେଟେର ଦିକେ ଲକ୍ଷ ରାଖତେ ହବେ । ପୋଲାଓ-କୋର୍ମା ଖାଓଯାନୋ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନା । ଖିଦେ ଲାଗଲେ ଖାବେ, ନା ଲାଗଲେ ନାହି ।'

'ଗୋଶତଗୁଲିଓ ତୋ ମନେ ହଚ୍ଛେ ପ୍ଲାସ୍ଟିକେର ।'

ରାନା ବଲଲ, ସବାଇ ହାତେ ହାତେ ନିଯେ ନାଓ — ପାରହେଡ ଦୁଟା କରେ ପରୋଟା ।

ନଇମା କିଛୁଇ ଖେଲ ନା । ସେ ଢାକା ଚଲେ ଯାବେ । କିଛୁତେହି ଥାକବେ ନା । ତାକେ ଟିକେଟ କେଟେ ରାତେର ଟ୍ରେନେ ତୁଲେ ଦିଲେଇ ହବେ । ତାକେ ଅନେକ ବୋବାନୋର ଚେଷ୍ଟା କରା ହଚ୍ଛେ, ସେ ବୁଝା ମାନଛେ ନା ।

ନୀରା ବଲଲ, ଏତ କାହେ ଏମେ ଫିରେ ଯାବି ?

'ହଁଁ, ଫିରେ ଯାବ ।'

'ଏଥିନ ତୋ ଆର କୋନୋ ସମସ୍ୟା ନେଇ ।'

'ସମସ୍ୟା ନେଇ, ସମସ୍ୟା ହବେ । ଆମାର ଶିକ୍ଷା ହୟେ ଗେଛେ ।'

ନୀରା ବଲଲ, ଦେଖ ନଇମା, ଦାରୁଚିନି ଦ୍ୱିପ ହଚ୍ଛେ ଆମାଦେର ଜନ୍ୟ ଏକଧରନେର ତୀର୍ଥ । ତୀର୍ଥେ ଯାବାର ଜନ୍ୟ ସବାଇ ମନ ଠିକ କରେ ଅନେକେ ରଙ୍ଗଳାଓ ହୟ, କିନ୍ତୁ ତାର ପରେଓ ସବାର ତୀର୍ଥ-ଦର୍ଶନ ହୟ ନା । ତୁହି ଏତ ବଡ ସୁଯୋଗ ହେଲାଯ ହାରାବି ?

'ହଁଁ, ହାରାବ । ଆମି ଏତ ପୁଣ୍ୟବାନ ନଇ ଯେ ତୀର୍ଥ-ଦର୍ଶନ କରବ । ତୋରା ଯା ।'

'ତୁହି ସତି ଯାବି ନା ?'

'ନା ।'

ঠিক হল, নইমা ঢাকায় ফিরে যাবে। তার গায়ে জ্বর এবং বেশ ভাল জ্বর। তাকে একা একা ছেড়ে দেয়া যায় না। ছেলেদের একজন—কাউকে সঙ্গে যেতে হবে। কে যাবে সঙ্গে? রানা বলল, লটারি হবে। লটারিতে যার নাম উঠবে, সে যাবে। এটা ফাইন্যাল ডিসিশন। এ ছাড়া উপায় নেই। কাগজের টুকরায় সব ছেলেদের নাম লেখা থাকবে। নইমা চোখ বন্ধ করে একটা নাম তুলবে। যার নাম উঠবে তাকে যেতেহি হবে —।

লটারি হল। নাম উঠল রানার। তার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল।

সঙ্গু বলল, দলপতি চলে গেলে আমাদের হবে কী করে? দলপতিকে তো যেতেহি হবে। রানা থাকুক, আমি যাব।

রানা ক্ষীণ গলায় বলল, তুই যাবি?

সঙ্গু বলল, যে সব ব্যবস্থা করল, তা ছাড়া আমার চাকরির একটা ইন্টারভুও আছে। তার প্রিপারেশন দরকার।

রানা বলল, তোরা কি মিটিপান খাবি? পান নিয়ে আসি। রানা পান আনার কথা বলে সরে পড়েছে — কারণ তার চোখে পানি এসে গেছে। সঙ্গুটা এত ভাল কেন?

মানুষকে এত ভাল হতে নেই। মানুষকে কিছুটা খারাপ হতে হয়। সঙ্গুর ইন্টারভু — এইসব বাজে কথা। সে এই কাজটা করল তার দিকে তাকিয়ে।

ঢাকাগামী তৃণা নিশীথা ছেড়ে দিচ্ছে। দরজা ধরে সঙ্গু দাঢ়িয়ে আছে। সঙ্গুর মুখ হাসি হাসি। সে হাত নাড়েছে। রানার খুব ইচ্ছা করছে টেনে সঙ্গুকে নামিয়ে সে লাফ দিয়ে উঠে পড়ে। কিন্তু সে জানে এই কাজটা সে পারবে না। সবার লোভ হয়, করতে পারে না। এই পৃথিবীতে খুব অল্পসংখকে মানুষই আছে যারা জীবনের মোহের কাছে পরাজিত হয় না। সে সেই অল্প ক'জনের একজন নয়। তার জন্ম হয়েছে — লোভের কাছে, মোহের কাছে বারবার পরাজিত হবার জন্যে।



ইঞ্জিন বসানো ছিপছিপে ধরনের নৌকা। মাথার উপর একচিলতে ছাদ। ছাদের নিচে ইঞ্জিন। দেখলে বিশ্বাস হয় না এরা সমুদ্রে মাছ ধরতে যায়। কিন্তু মাঝি যখন বলছে তখন বিশ্বাস করতে হবে।

নৌকায় বাংলাদেশি ফ্ল্যাগ উড়ছে। সেন্ট মার্টিন যেতে হলে বার্মার আকিয়াব শহরের পাশ দিয়ে যেতে হয়। জলযানগুলিতে সে কারণেই পতাকা ওড়াতে হয়। যাতে দূর থেকে বোঝা যায় — কোন নৌকা বাংলাদেশের, কোন গুলি বার্মার।

নৌকার মাঝি চিটাগাংয়ের প্রায় দুর্বোধ্য ভাষায় বোঝাল — ইয়ান নাফ নদী, ইয়ান অর্ধেক আঁরার, অর্ধেক বার্মার।

মোতলেব বলল, অত্যন্ত আপত্তিজনক কথা — নদীর আবার অর্ধেক অর্ধেক ভাগাভাগি কী? নদী হচ্ছে প্রেমিকার সতো। প্রেমিকার আবার ভাগাভাগি! এটা কি মগের মুল্লুক?

মাঝি দাঁত বের করে বলল, ইয়ান মগের মুল্লুক। বার্মাইয়ারা বেগগুন মগ।

আনুশকা বলল, ঢেউ কেমন?

'আছে, ছোড় ছোড় গইব।'

'কী বলছেন, বাংলা ভাষায় বলুন — ছোড় ছোড় গইব মানে কী?'

মাঝি আনন্দিত গলায় বলল, অল্প বিস্তর ঢেউ।

ঢেউ যা উঠছে তাকে অল্প বিস্তর বলাটা ঠিক হচ্ছে না। নীরা মুখ কালো করে ঢেউ দেখছে।

মুনা বলল, কী নীল পানি দেখছেন আপা? নদীর পানি এত নীল হয়? আশ্চর্য!

নীরা জবাব দিল না। নাফ নদীর নীল পানি তাকে অভিভূত করতে পারছে না।

হঠাৎ তার মনে পড়েছে, সে সাঁতার জানে না। সে রানার দিকে তাকাল।

রানা খুব ব্যস্ত হয়ে নৌকায় জিনিসপত্র তুলছে। মালামালের সঙ্গে প্রচুর ডাবও যাচ্ছে। রানা কোথেকে যেন সন্তা দরে আঠারোটা ডাব কিনেছে। সাগরে মিষ্টি পানির সাপ্লাই।

মোতালেব রানাকে সাহায্য করছে। বল্টু দাঁড়িয়ে আছে এক পাশে। বল্টুর মন খুব খারাপ। ট্রনে ওঠার পর থেকে মুনা তার সঙ্গে একটা কথাও বলেনি। এর মানে সে বুঝতে পারছে না।

মুনার পুরো ব্যাপারটাই সবসময় তার কাছে এক ধরনের রহস্য। মেয়েটা তাকে পছন্দ করে, না করে না? তাকে সে একটা স্বয়়েটার কিনে দিয়েছে। ধরে নেয়া যেতে পারে, পছন্দ করে বলেই দিয়েছে। কিন্তু কথাবার্তায় কিংবা আচার-আচরণে তার কোনো প্রমাণ নেই।

বল্টুর একবার ধারণা হয়েছিল, তার বড় ভাই উপস্থিত বলেই মুনা তার সঙ্গে কথা বলছে না। মেয়েরা আড়াল পছন্দ করে। কিন্তু সঙ্গী তো কাল রাতেই চলে গেছে। এর পরেও মুনা কথা বলবে না কেন? বল্টু নিজ থেকে উদ্যোগ নিয়ে আজ ভোরবেলা কথা বলার চেষ্টা করেছে। মুনাকে গিয়ে খুব স্বাভাবিকভাবে বলেছে — মুনা, চা খেতে যাবি? একটা দোকানে দেখলাম গুড়ের চা বানাচ্ছে।

মুনা বলল, গুড়ের চা খাবার জন্যে আমি খুব ব্যস্ত হয়ে আছি আপনাকে কে বলল? চিনির চা-ই খাই না, তো গুড়ের চা।

‘চা না খেলে না খাবি — চল, হেঁটে আসি।’

‘আপনার সঙ্গে হাঁটিতে যাব?’

‘হ্যাঁ। অসুবিধা আছে?’

‘অবশ্যই অসুবিধা আছে। বাঁটকু লোকের সঙ্গে আমি হাঁটি না। লোকজন দেখে ফিক ফিক করে হাসে। তারা গলে মনে বলে — লম্বা মেয়েটা এই বাঁটকুটার সঙ্গে হাঁটছে কেন?’

বল্টুর মন এই কথায় অত্যন্ত খারাপ হল। এই-জাতীয় কথা কি কেউ বলতে পারে? বলতে পারা কি উচিত? মুনার দেয়া স্বয়়েটার সে এখন পরে আছে। ইচ্ছা করছে স্বয়়েটারটা খুলে টেকনাফের নদীতে ফেলে দিতে। দরকার নেই শালার স্বয়়েটারের!

রানা বিরক্ত গলায় বলল, তোরা সব হাবার মতো তীব্র দাঁড়িয়ে আছিস কেন? আমাদের কি রওনা দেয়া লাগবে না? জোয়ার-ভাটার ব্যাপার আছে। যাকে বলে সমুদ্র্যাত্ম। এক্ষুনি রওনা দিতে হবে। নো ডিলে।

নীরা নিচু গলায় বলল, আমি যাচ্ছি না।

রানা হতভস্ব হয়ে বলল, আমি যাচ্ছি না মানে?

‘আমি সাঁতার জানি না।’

‘আমরা তো সাঁতরে যাচ্ছি না। নৌকায় করে যাচ্ছি।’

‘আমার ভয় লাগছে। আমি যাব না।’

ରାନା ଅନେକ କଟେ ନିଜେକେ ସାମଲେ ନିଯେ ଶାନ୍ତ ଗଲାଯ ବଲାର ଚେଷ୍ଟା କରଲ — ଡେ
ଯ ଏକଟୁ ନଦୀତେହ ଦେଖା ଯାଛେ — ନୋକା ସମୁଦ୍ର ପଡ଼ିଲେଇ ସବ ଶାନ୍ତ । ତାହିଁ ନା ମାଧ୍ୟ ?

ମାଝି ହାସିମୁଖେ ବଲଲ, ଉଚ୍ଚା କଥା ନ-କହିଓ । ସାଗରେ ଡାଙ୍ଗର ଡାଙ୍ଗର ଗହର ଡେ ।
ତୁହିଁ ନ-ଜାନ ?

ନୀରା ବଲଲ, ଅସନ୍ତବ, ଆମି ଯାବ ନା । ଆମାକେ ବାଟି ଦିଯେ କୁଚିକୁଚି କରେ କେଟେ
ଫେଲିଲେଓ ଯାବ ନା ।

ଆନୁଶକା ବଲଲ, ଶୋନ ନୀରା, ତୀର୍ଥଶ୍ଵରେ ସବାର ଯାବାର ମୌଭାଗ୍ୟ ହୟ ନା । ଅନେକେହ
ଖୁବ କାହିଁ ଥେବେ ଫିରେ ଯାଯ . . .

ନୀରା ଆନୁଶକାକେ ଥାମିଯେ ଦିଯେ ବଲଲ, ସ୍ୟାରି, ଏକ ସମୟ ଆମି ଏରକମ କଥା
ବଲେଛିଲାମ । ଆମି ସବାର କାହେ ହାତ ଜୋଡ଼ କରେ କ୍ଷମା ଚାଛି । ଆମି ଯାବ ନା । ପ୍ରୀଜ,
ନା ।

ନୀରାର ଗଲାଯ ଏମନ କିଛୁ ଛିଲ ଯେ ସବାଇ ବୁଝିଲ, ନୀରା ଯାବେ ନା । କେଉ କିଛୁ ବଲଲ
ନା । ଦୀର୍ଘ ସମୟ ସବାଇ ଚୂପଚାପ । ରାନାର ଚୋଖେ ପଲକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ିଛେ ନା ।

ଜରୀ ବଲଲ, ନୀରା, ମତି ଯାବେ ନା ?

‘ନା ଜରୀ । ଆମି ଯାବ ନା । ନୋକାଯ ଉଠିଲେଇ ଆମି ଭୟେ ମରେ ଯାବ । ଆମି ପାନି
ଅସନ୍ତବ ଭର ପାଇ । ତୋଦେର ସଙ୍ଗେ ଠିକ କରେଛି କିନ୍ତୁ ଆସଲ କଥାଟାଇ କଥିନୋ ମନେ
ଆମେନି ।’

ମୁନା ବଲଲ, ତାହଲେ କୀ ହବେ ?

‘ଆମାକେ ନିଯେ କାଉକେ ଚିନ୍ତା କରତେ ହବେ ନା । ଆମି ଏକଟା ବାସ ଧରେ
କ୍ଷୁବ୍ଧବାଜାର ଚଲେ ଯାବ । ମେଥାନ ଥେବେ ଢାକା ।’

ଆନୁଶକା ବଲଲ, ଏଟା ଏକଟା କଥା ହଲ ?

‘ଆମି ଯା କରଛି ଖୁବ ଅନ୍ୟାଯ କରଛି । ଆମି ମେଟା ଜାନି ।’

‘ଭୟକେ ଜର କରତେ ହର ନୀରା ।’

‘ସବ ଭୟ ଜର କରା ଯାଯ ନା ।’

ରାନା ବଲଲା, ଏଥନ ତା ହଲେ କୀ କରା ? ନୀରାକେ ଏକା ଏକା ଯେତେ ଦେଯା ଯାଯ ନା ।
ଏକଜନ-କାଉକେ ନୀରାର ସଙ୍ଗେ ଯେତେ ହବେ । କେ ଯାବେ ?

ବଲ୍ଟୁ ବଲଲ, ଆମି । ଆମି ନିଯେ ଯାବ ।

ମୁନା ଅବାକ ହୟେ ବଲ୍ଟୁର ଦିକେ ତାକିଯେ ଆଛେ । କୀ ବଲଛେ ଏହି ମାନୁଷଟା ? ମେ କି
ମୁନାର ଉପର ରାଗ କରେ ବଲଛେ ? ଏତ ରାଗ କେନ ? ମୁନାର ସମ୍ପଦ ଅନ୍ତରାତ୍ମା କେଂଦ୍ରେ ଉଠିଲ ।
ତାର ଚେହରେ ବଲତେ ଇଚ୍ଛା କରଲ — ଅଯନ ଭାଇ, ଆପଣି ଯାବେନ ନା । ପ୍ରୀଜ, ପ୍ରୀଜ ।
ଆମି ନିତାନ୍ତରୁ ଦରିଦ୍ର ପରିବାରେର ଏକଟା ମେଯେ । ଆପଣିଓ ହତ-ଦରିଦ୍ର ଏକଜନ ମାନୁଷ ।
କୋନୋଦିନ ଯେ ଆବାର ଆମରା ସମୁଦ୍ରେ କାହେ ଆସତେ ପାରବ — ଆମାର ମନେ ହୟ ନା ।

কী সুন্দর একটা সুযোগ ! আমার উপর রাগ করে আপনি এই সুযোগটা নষ্ট করবেন না। আমি জানি, আমি নানানভাবে আপনাকে কষ্ট দিই। আপনাকে আহত করি। কেন করি আমি নিজেও জানি না। প্রতিবার কষ্ট পেয়ে আপনি যখন মুখ কালো করেন তখন আমার হচ্ছা করে খুব উচু একটা বিলিডং-এ উঠে সেখান থেকে লাফিয়ে রাস্তায় পড়ে যেতে। অয়ন ভাই, বলুন তো আমার স্বভাবটা উল্টো হল কেন ? কেন আমি আর দশটা মেয়ের মতো স্বাভাবিক হলাম না ? আপনার ধারণা, আমি খুব বাজে ধরনের একটা মেয়ে। আপনার এই ধারণা সত্যি নয়। খুব ভুল ধারণা। আমি যে কত ভাল একটা মেয়ে সে জানে শুধু আমার মা। একদিন আপনিও জানবেন। সেই দিনটির জন্যে আমি কত যে আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছি ! অয়ন ভাই, আমাদের আর্থিক অবস্থাটা যে কত খারাপ সেটা তো আপনি জানেন — তার পরেও মাঝ সংসার-খরচের টাকা চুরি করে আপনার জন্যে একটা সুয়েটার কিনলাম। আপনার একটাই সুয়েটার। সেটাও অনেকখানি ছেঁড়া। ছেঁড়া ঢাকার জন্যে আপনি সবসময় সুয়েটারের উপর একটা শার্ট পরেন। একদিন আমাকে বললেন — মানুষ কেন যে শার্টের উপর সুয়েটার পরে আমি জানি না। কী বিশ্বী লাগে দেখতে ! মনে হয় শার্টের উপর একটা ভারী গেঞ্জি পরে আছে।

আপনার কথা শনে আমি সেদিন কী কষ্ট যে পেয়েছিলাম ! সারা রাত কেঁদেছি আর বলেছি, কেন একজন মানুষ আপনার মত দরিদ্র হয় — আর কেন আরেকজন হয় শুভ ভাইয়ার মতো ধনী ?

নানা ধরনের কষ্টের মধ্যে আমি বড় হচ্ছি। একধরনের আশা নিয়ে বড় হচ্ছি — গভীর বাতে ঘূম ভেঙে হঠাৎ মনে হয় — হয়তো সামনের দিনগুলি অন্যরকম হবে।

অয়ন ভাই, আমি একটা ঘোরের মধ্যে আপনার সঙ্গে দৌড়াতে দৌড়াতে টেনে উঠে পড়লাম। সবাই আমার দিকে চোখ বড় বড় করে তাকাচ্ছিল। আমি কিন্তু একটুও লজ্জা পেলাম না। মনে মনে বললাম — এই ব্যাপারটা নিয়তি সাজিয়ে রেখেছে। নিয়তি চাচ্ছে আমি যাই আপনার সঙ্গে।

রাতে একসময় আপনার সবাই ঘুমিয়ে পড়লেন। আমি কিন্তু জেগে রইলাম। জেগে জেগে ঠিক করলাম দারঢ়চিনি দ্বাপে নেমে আমি কী করব। কী করব জানেন ? আমি আপনার কাছে গিয়ে বলব — অয়ন ভাই, আসুন তো আমার সঙ্গে — সমুদ্রে কোমর পর্যন্ত ডুবিয়ে দাঁড়াই। আপনি অবাক হয়ে আসবেন আমার সঙ্গে। আমি এক সময় বলব, আমার কেমন যেন ভয়-ভয় লাগছে। আপনি আমার হাতটা একটু ধরুন তো ! আপনি হাত ধরবেন আর সঙ্গে আমি বলব — অয়ন ভাই, আমি আপনাকে নিয়ে এত ঠাট্টা-তামাশা করি। আমি জানি আপনি খুব রাগ করেন। কিন্তু আমি যে আপনাকে কতটা ভালবাসি তা কি আপনি জানেন ? এই সমুদ্রে যতটা

পানি আছে, বিশ্বাস করুন অয়ন ভাই, আপনার প্রতি আমার ভালবাসা তারচে' অনেক অনেক গুণ বেশি। অয়ন ভাই, এখন যদি আপনি চলে যান তা হলে আমি কথাগুলি কীভাবে বলব?

মুনা মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। রানা নীরার সুটকেস নামিয়ে দিচ্ছে। রানা বলল, মুনা, তুই দাঁড়িয়ে আছিস কেন? উঠে আয়। মুনা উঠে এল।

নৌকা ছেড়ে দিয়েছে। ইঞ্জিনের ভট্ট ভট্ট শব্দ হচ্ছে। ভাল দুলুনি হচ্ছে। নীরা হাত নাড়ছে। বল্টু হাত নাড়ছে না। সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে।

আনুশকা বলল, যেভাবে মানুষজন কমছে শেষ পর্যন্ত ক'জন গিয়ে দারুচিনি দীপে পৌছব কে জানে?

নদীর মোহনা ছেড়ে নৌকা সাগরে পড়ল। গাঢ় নীল সমুদ্র।

যেন এক জীবন্ত নীলকান্ত মণি। শুভ্র মুগ্ধ বিস্ময়ে বলল, এত সুন্দর! এত সুন্দর!

বড় বড় ঢেউ উঠতে শুরু করেছে। নৌকা খুবই দুলছে। রানা ভীত গলায় বলল, আমরা সবাই কি যারা পড়ব নাকি? ভয়াবহ অবস্থা দেখি! জরী, তোমার ভয় লাগছে?

জরী বলল, না।

এক-একটা বড় ঢেউ আসছে। পাগলী মেয়েটা খিলখিল করে হেসে উঠছে।

আনুশকা বলল, এই মেয়েটার একটা নাম দেয়া দরকার। কী নাম দেয়া যায়? মোতালেব, একটা নাম বল তো!

মোতালেব বলল, নিজে বেঁচে থাকলে তারপর অন্যের নাম। অবস্থা যা দেখেছি বাঁচব বলে তো মনে হয় না। মাঝি ভাই, বলেন তো নৌকা ডোবে কখনও?

মাঝি সহজ গলায় বলল, ভুবে। আকছার ভুবে।

'মিশ্য ঝড়-তুফানের সময় ডোবে। আজ তো ঝড়-তুফান নেই। তাই না মাঝি?'

'আশুন মাসে সাগর মাঝেমহিদ্যে বিনা কারণে পাগলা অয়। তখন বড়ই সবস্যা।'

'আজ কি সাগর পাগলা হয়েছে?'

'হেই রকমই মনে লয়।'

রানা বলল, ফিরে যাবার আইডিয়াটা তোমাদের কাছে কেমন মনে হচ্ছে আনুশকা?

'খুব খারাপ মনে হচ্ছে। যে ফিরে যেতে চায় তাকে ফিরতে হবে সাঁতার দিয়ে।'

মোতালেব বলল, ভয় যে পরিমাণ লাগছে — ভয়ের চোটে একটা কেলেক্ষারি না করে ফেলি — কিংবা কে জানে হয়তো ইতিমধ্যেই কেলেক্ষারি করে ফেলেছি। শরীরটা হালকা হালকা লাগছে।

জরী হেসে ফেলল। হাসতে হাসতে বলল, ভয়ের মধ্যেও তোমার সেন্স অব হিউমার যে নষ্ট হয়নি সেটা খুব ভাল লক্ষণ না।

আনুশকা বলল, আচ্ছা, আমরা এই মেয়েটার কেউ কোনো নাম দিচ্ছি না কেন? শুভ, তুমি এর একটা নাম দাও —

‘আমি ওর নাম দিলাম — ডুমি। ঢেউ।’

‘জরী, তোর মাথায় কি কোনো নাম আসছে?’

‘না, আমার মাথায় কোনো নাম আসছে না। আমার এখন কেবল জানি ভয়-ভয় লাগছে। মাঝি, নৌকা উল্টাবে না তো?’

‘সবই আল্লাহর ইচ্ছা আস্মা।’

ডেউয়ের পানি পাহাড়ের মতো সারি বেঁধে ছুটে আসছে। শুভ মুগ্ধ বিস্ময়ে বলল, কি সুন্দর, অথচ কী ভয়ংকর!

মাঝি চেঁচিয়ে বলল, নৌকা ধর, গরি ধরিঅবে বহইয়। অবস্থা ভাল ন-দেকিব।

শুভ নৌকা ধরল না। সে চেঁচিয়ে বলল, দেখো দেখো, সমুদ্র-সারস। সমুদ্র-সারস। তারা নৌকাকে ঘিরে ঝাঁক বেঁধে উড়ছে। মনে হচ্ছে তারা যাচ্ছে কোনো-এক অজ্ঞান দারুচিনি দ্বীপে।

আনুশকা বলল, দ্বীপটা কি দেখা যায়?

মাঝি আঙুল তুলে দেখাল। হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে। ঐ তো দেখা যায়। এত সুন্দর! আশ্চর্য, এত সুন্দর!



ইয়াজডিন সাহেব ঠিক করে রেখেছিলেন সারা দিন ঘরেই কাটাবেন। রাতে স্ত্রীকে নিয়ে বেড়াতে যাবেন। বন্ধুবাকবের বাসায় নয়। তেমন কোনো বন্ধুবাকব তাঁর নেই। গাড়িতে উঠে বসবেন — ডাইভারকে বলবেন, ঢাকা—চট্টগ্রাম হাইওয়ে ধরে খানিকক্ষণ যাও। অতি দ্রুত রাস্তায় খানিকক্ষণ ঘূরলে ভাল লাগে। মানুষের জন্মই হয়েছে দ্রুত চলার জন্যে, এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকার জন্যে না। গাছ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকবে। মানুষ গাছ নয়।

তিনি অপেক্ষা করছেন টেলিফোন কলের জন্য। রফিকের সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছে। তিনি খবর পেয়েছেন, তারা হাজত থেকে ছাড়া পেয়েছে। তিনি কথা বলতে চান মনিরুজ্জামানের সঙ্গে। ব্যবস্থা করা হয়েছে।

টেলিফোন বাজছে।

তিনি রিসিভার কানে ধরলেন। মৃদু গলায় বললেন, কে কথা বলছেন?

‘স্যার আমি — আমি মনিরুজ্জামান।’

‘কী ব্যাপার?’

‘স্যার, আমি আপনার কাছে ক্ষমাপ্রাপ্তি। আমি, আমি . . .’

‘ঠিক আছে, আপনাকে ক্ষমা করা হল — এই মেয়েটির যদি কোনোরকম সমস্যা হয় . . .’

‘স্যার, কোনো সমস্যা হবে না।’

‘গুড়।’

ইয়াজডিন সাহেব টেলিফোন নামিয়ে রাখলেন। “মুন ইজ ডাউন” বইটির শেষ পাতাটা পড়া বাকি ছিল। শেষ পাতা পড়লেন। বইটা তাঁর ভাল লাগেনি। তিনি ভেবেছিলেন, হয়তো শেষ পাতায় নতুন কিছু বলা হবে। তাও না। বইটিতে এমন এক জগতের কথা বলা হয়েছে, যে জগতের অস্তিস্ত আছে শুধুই কল্পনায়। বাস্তব পৃথিবী এমন নয়। বাস্তব পৃথিবীতে মনিরুজ্জামানরা বাস করে। শুভ এই সত্যটা কখন বুবাবে? যদি বুবাতে পারত তা হলে এই বইটি ডাস্টবিনে ফেলে দিত। তাঁর নিজের সেরকমই ইচ্ছা হচ্ছে, কিন্তু শুভ এই বই তাঁকে দিয়েছে জন্মদিনের উপহার হিসেবে। অস্তর সুন্দর একটি বাক্য লিখে দিয়েছে। এত সুন্দর কথা লেখা একটা বই তিনি দূরে সরিয়ে রাখতে পারেন না। কিন্তু তাঁর সম্পর্কে শুভর প্রসেসমেন্ট ঠিক

নয়। তিনি আদর্শ মানুষ নন। একজন আদর্শ মানুষ কোটি টাকা উপর্যুক্ত করতে পারে না। আমাদের প্রফেট আদর্শ মানুষ ছিলেন। তাঁর ছিল দিনে আনি, দিনে খাই অবস্থা।

আচ্ছা, শুভ্র কি আদর্শ মানুষ হবে? যদি হয় একদিন তারও তো তা হলে দিনে আনি দিনে খাই অবস্থা হবে! তিনি কি তা সহ্য করতে পারবেন? কিন্তু তিনি চান শুভ্র আদর্শ মানুষ হোক। শুভ্র যে রাতে জন্ম হল সে রাতে তিনি বড় ধরনের একটা অন্যায় করে বিশাল অঙ্কের টাকা পেয়ে গেলেন। ব্রীফকেস ভর্তি টাকা নিয়ে হাসপাতালে গেলেন ছেলেকে দেখতে — আহা, কী সুন্দর, কী ফুটফুটে ছেলে! নবজাতক শিশু হাসতে পারে না — কিন্তু তিনি পরিষ্কার দেখলেন যে, ফুলের মতো শিশু তাঁর দিকে তাকিয়ে হাসল। হয়তো তাঁর চোখের ভুল। হয়তো তাঁর কল্পনা। কিন্তু তিনি দেখলেন। নার্স বলল, বাচ্চা কোলে নেবেন?

তাঁর হাত অশুচি হয়ে আছে। এই অশুচি হাতে বেহশতের ফুল স্পর্শ করা যায় না। তবু তিনি দুঃহাত বাড়িয়ে বললেন — দিন। আমার কোলে দিন!

বাচ্চাটিকে কোলে নিয়ে তিনি তার নাম রাখলেন — শুভ্র। তিনি মনে মনে বললেন — আমার এই ছেলেকে যেন পৃথিবীর কোনো মালিন্য, কোন নোংরামি কখনো স্পর্শ না করে — সে যেন তার নামের মতোই হয়।

আচ্ছা, শুভ্র কি পারবে? নিশ্চয়ই পারবে। কেন পারবে না? সৎ প্রবৃত্তি নিয়েই মানুষ জন্মায়। চারপাশের মানুষ তাকে অসৎ করে। তিনি শুভ্রকে সবার কাছ থেকে আলাদা করে রেখেছেন। পৃথিবীর কোনো মালিন্য শুভ্রের কাছে ভিড়তে দেননি।

তিনি কোটি কোটি টাকা শুভ্রের জন্যে রেখে যাচ্ছেন। টাকার পরিমাণ কল্পনার উপরে। এই অর্থ সৎ অর্থ নয়। শুভ্র এই অর্থ দিয়ে কী করে তা তাঁর দেখার ইচ্ছা। মতুর পর কোনো—একটা জগৎ যদি সত্য থাকে তা হলে সেখান থেকে তিনি খুব আগ্রহ নিয়ে ছেলের কাঙ্কারখনা দেখবেন।

ইয়াজউদ্দিন সাহেব গাড়ি বের করতে বলে স্ত্রীর খোজে গেলেন। নিশ্চিয়তে হাইওয়েতে ছুটে বেড়ানো রাহেলার পছন্দের কর্মকাণ্ডের একটি নয়। তিনি হয়তো যেতে চাইবেন না।

রাহেলার ঘর অঙ্ককার। তিনি বাতি জ্বালালেন। অঙ্ককার ঘরে খাটের ঠিক মাঝখানে জবুথবু হয়ে রাহেলা বসে আছেন।

‘কী হয়েছে?’

রাহেলা ক্ষীণ গলায় বললেন, কিছু না।

‘ঘর অঙ্ককার করে এভাবে বসে আছ কেন?’

‘আমার শুভ্রের জন্যে খুব খারাপ লাগছে।’

‘আবার দুশ্চিন্তা করছ?’

রাহেলা শ্বেণি কঠে বললেন, একদিন তুমি আমি — আমরা কেউ থাকব না।
আমার এই ছেলের চোখ নষ্ট হয়ে যাবে। কে তখন দেখবে আমাদের শুভকে?

ইয়াজউদ্দিন সাহেব স্ত্রীর কাঁধে হাত রেখে বললেন, চলো, ঘুরে আসি। ১০০
কিমি স্পীডে হাইওয়ে দিয়ে গাড়ি চালাব। আমি চালাব, তুমি বসে থাকবে পাশে।
আর শোনো রাহেলা — যা হবার তাই হবে — “কে সারা সারা”।

‘আমরা কোথায় যাচ্ছি?’

‘এখনো জানি না কোথায় যাচ্ছি। আগে চলো গাড়িতে উঠি।’

‘আমার শরীরটা ভাল লাগছে না।’

‘তোমার শরীর ঠিকই আছে। আসলে তোমার মন ভাল নেই। গাড়িতে উঠলেই
তোমার মন ভাল হতে শুরু করবে। মন ভাল হয়ে গেলেই শরীর ভাল লাগতে শুরু
হবে।

ঢাকা-চিটাগাং হাইওয়ে দিয়ে গাড়ি ছুটে যাচ্ছে। ইয়াজউদ্দিন সাহেব এক্সিলেটারের
চাপ ক্রমেই বাড়াচ্ছেন। রাহেলা বসে আছেন মূর্তির মতো। ইয়াজউদ্দিন সাহেব
বললেন, তোমার কি তয় লাগছে রাহেলা?

রাহেলা যন্ত্রের মতো বললেন, না।

‘গুড়। জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখো কত সুন্দর চাঁদ উঠেছে। চাঁদটাও ছুটছে
আমাদের সঙ্গে। দেখছ?’

‘ইঁ।’

‘তোমার কি মনে হয় হাত বাড়ালেই চাঁদটাকে ছেঁয়া যায়?’

রাহেলা এই প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বললেন, তুমি আমাকে একটা সত্যি কথা
বলবে?

ইয়াজউদ্দিন সাহেব গাড়ির স্পীড আরো খানিকটা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, আমি
কখনো তোমার সঙ্গে মিথ্যা কথা বলিনি।

‘তাহলে বলো, শুভ আর কতদিন পরে চোখে দেখতে পাবে? ডাক্তারের সঙ্গে
তোমার কথা হয়েছে। তুমি এটা জান। আমাকে বলো।’

ইয়াজউদ্দিন সাহেব গাড়ির গতি কমিয়ে একসময় গাড়ি থামিয়ে ফেললেন।
যতদূর দৃষ্টি যায় — ধানক্ষেতে। ধানক্ষেতের মাথার উপর বিশাল চাঁদ। ইয়াজউদ্দিন
সাহেব গাড়ি থেকে নামতে নামতে বললেন, রাহেলা, তুমিও নামো —।

‘তুমি আমার প্রশ্নের জবাব দাওনি। জবাব দাও।’

ইয়াজউদ্দিন সাহেব চাঁদের দিকে তাকিয়ে আছেন। মনে হচ্ছে প্রশ্নটা শুনতে
পাননি। রাহেলা গাড়ির ড্যাসবোর্ডে মাথা রেখে কাঁদছেন।



দারুচিনি দ্বীপে জোছনার ফিনিক ফুটেছে। দ্বীপের চারপাশের জলবাশিতে প্রতিফলিত হচ্ছে চাঁদের আলো। এই আলো স্থলভূমির আলোর চেয়েও অনেক রহস্যময়। তীব্র অথচ শান্ত। এই আলো কোনো—এক অস্তুত উপায়ে সরাসরি হাদরের অঙ্ককার কৃষ্ণরিতে চলে যায়। মানুষের মনে তীব্র এক হাহাকার জেগে ওঠে। সেই হাহাকারের কারণ মানুষ জানে না। প্রকৃতি তার সব রহস্য মানুষের কাছে প্রকাশ করে না।

শুভ বসেছে একেবারে জরীর গা ঘেসে। জরীর অন্য পাশে আনুশকা। তাদের কাছ থেকে অনেকটা দূরে সমুদ্রের কাছাকাছি মুনা আছে। মোতালেব এবং রানা অস্তির ভঙ্গিতে ইঁটাহাঁটি করছে। তাদের দৃষ্টি বড় একটা প্রবাল খণ্ডের উপর বসে থাকা পাগলী মেঝেটির দিকে। মেঝের ভব ভঙ্গি ভাল লাগছে না। মাথা ঠিক নেই কখন কি করে বসে। হয়ত খাপ দিয়ে সমুদ্রে পড়ে গেল।

আনুশকা শুভ্রের দিকে তাকিয়ে বলল, কেমন লাগছে শুভ?

‘খুব খারাপ লাগছে?’

আনুশকা বিস্প্ত হয়ে বলল, খারাপ লাগছে কেন?

শুভ সহজ গলায় বলল, এত সুন্দর পৃথিবী কিন্তু আমি এই সুন্দর বেশিদিন দেখব না। আমার চোখ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আর অল্প কিছুদিন তারপর আমি সত্যি সত্যি কানাবাবা হয়ে যাব।

জরীর বলল, কি বলছ তুমি?

‘সত্যি কথা বলছি। আমিতো কখনো মিথ্যা বলি না। যার নাম শুভ সে মিথ্যা বলবে কি করে? আমার চোখের নার্ভ শুকিয়ে যাচ্ছে।’

আনুশকা বলল, এই প্রসঙ্গটা থাক। অন্য কিছু নিয়ে কথা বলা যাক। এসো আমরা সবাই আমাদের জীবনের একটা সুন্দর অভিজ্ঞতার গল্পবলি। ডাক ডাক সবাইকে ডাক। এই তোমরা আস।

সবাই এল। শুধু পাগলি বসে রইল। পাথরের উপর। আমি আমার জীবনের একটা সুন্দর অভিজ্ঞতার গল্প বলব — তারপর তোমরা বলবে। তারপর সবাই মিলে হাত ধরাধরি করে সমুদ্রে নমব। গল্পটা হচ্ছে — ইন্টারমিডিয়েট পাশ করার পর আমার মা মারা যান। আমি খুব একলা হয়ে পড়ি। তখন আমার বাবা প্রায়ই

আমাকে নিয়ে গ্রামে ঘূরতে যেতেন। একবার নেএকোনার এক গ্রামে গিয়েছি।
সন্ধ্যাবেলা এক বাড়িলের ঘরে বাবা আমাকে নিয়ে উপস্থিত হলেন। কি যে সুন্দর সেই
বাড়িলের চেহারা — অবিকল শুভ্রের মত। বড় বড় চোখ কি অস্তুত দৃষ্টি। বাবা
বললেন — আমার এই মেয়ের মনটা খুব খারাপ। আপনি গান গেয়ে আমার
মেয়েটার মন ভাল করে দিন। বাড়ি এক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থাকতে
থাকতে গান ধরল —

“তুই যদি আমার হইতি

আমি হইতাম তোর।

কোলেতে বসাইয়া তোরে করিতাম আদর
বন্ধুরে . . .”

কি যে অস্তুত গান — আমার শরীর থরথর করে কাঁপতে লাগল। ইচ্ছে করল
কাঁদতে কাঁদতে বাড়িকে বলি — আমি আপনার কোলে বসছি — নিন আমাকে
আদর করুন।

বলতে বলতে আনুশকার চোখে পানি এসে গেলো। সে চোখ মুছল না। জলভরা
চোখে জরীরের দিকে তাকিয়ে হাসলো।

জরী ছটফটে গলায় বলল, আমার কেমন জানি লাগছে। শুভ্র, আমার কেমন
জানি লাগছে।

আনুশকা জরীর হাত ধরে ফেলল। ভীত গলায় বলল, তুই এমন করছিস
কেন? তোর হাত-পা কাঁপছে!

জরী বলল, তুই আমার হাত ছাড়, আমি সমৃদ্ধে নামব।

‘অসন্তুষ্ট ! আমি তোকে ছাড়ব না।’

রানা বলল, পাগলী মেয়েটাকে তো দেখছি না। ও কোথায় ?

মোতালেব আঙুলের ইশারা করে দেখাল — ঐ তো, মেয়েটা সমৃদ্ধের ধার ষেসে
ছুটে যাচ্ছে।

আনুশকা বলল, ওকে তোমরা আটকাও। কী করছে এই মেয়ে ?

মোতালেব অস্বস্তির সঙ্গে বলল, আনুশকা, ঐ মেয়েটার কাছে তুমি একা যাও।
বুকতে পারছ না ও সব কাপড় খুলে ফেলেছে? ও নগু হয়ে দৌড়াচ্ছে।

আনুশকা বলল, তোমরা আমার সঙ্গে আসো। আমার একা যেতে ভয় লাগছে।
কী হচ্ছে এসব?

আনুশকা ছুটে যাচ্ছে। পাগলী মেয়েটার খিলখিল হাসির শব্দ শোনা যাচ্ছে।
আনুশকার পেছনে পেছনে যাচ্ছে মোতালেব এবং রানা।

জরী বলল, শুভ্র, সমৃদ্ধে নামবে? এসো।

শুভ্র বলল, এখন সমুদ্রে নেমো না জরী। আমার কেন জানি ভাল লাগছে না।
যদি নামতে হয় আমরা সবাই হাত ধরাধরি করে একসঙ্গে নামব।

‘না, আমি এখন নামব।’
‘প্লীজ জরী, প্লীজ।’

মধ্যরাতে তারা সবাই হাত ধরে একসঙ্গে সমুদ্রে নামল। আনুশকা বলল,
তোমরা সবাই তোমাদের জীবনের সবচে’ কষ্টের কথাটা সমুদ্রকে বলো। আমরা
আমাদের সব কষ্ট সমুদ্রের কাছে জমা রেখে ডাঙায় উঠে আসব। বলো মুনা, তুমি
প্রথম বলো —

মুনা শাস্ত গলায় বলল, আমার কোনো দৃঢ়খ নেই।

মুনার কথা শেষ হবার আগেই সমুদ্রের একটা বড় চেউ এসে সবাইকে ভিজিয়ে
দিল। সমুদ্র মনে হয় মিথ্যা কথা বুঝতে পারে। পাগলী মেয়েটি হেনে উঠল খিলখিল
করে।

শুভ্র হঠাৎ আতঙ্কিত গলায় বলল, আচ্ছা, জোছনা হঠাৎ কমে গেল কেন?

জোছনা কমেনি, জোছনা আরো তীব্র হয়েছে। মনে হচ্ছে সারা দীপে হঠাৎ করে
সাদা রঙের আগুন লেগে গেছে। কিন্তু শুভ্র কিছু দেখতে পাচ্ছ না কেন? শুভ্রের হাত
ধরে জরী দাঁড়িয়ে — এত কাছে, কিন্তু কই — জরীকে সে তো দেখতে পাচ্ছ না?

— x —

Created with an unregistered version of SCP PDF Builder

You can order SCP PDF Builder for only \$19.95USD from
<http://www.scp-solutions.com/order.html>